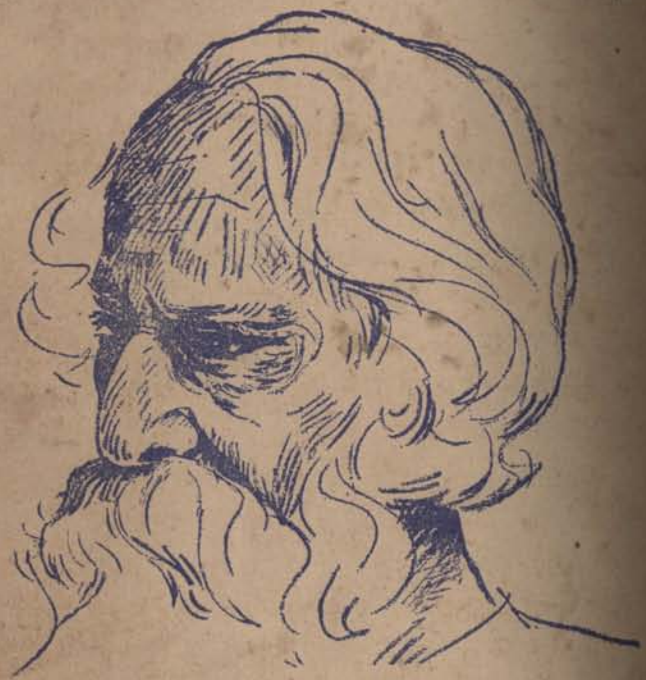
ARICHAYA :: MAY 1961 :: Regd. No. C 3963



"দেখেছি সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব আরোগ্যের,
আধমরা মানুষ নিয়ে দেশে কোনো বড় কাজের পত্তন
সম্ভব নয়, তারা কাজে ফাঁকি দেয় প্রাণের দায়ে, আর সেই
কারণেই প্রাণের দায় দুরূহ হ'য়ে ওঠে।
আমরা অনেক সময় দোষ দেই বাহ্য কারণকে — কিন্তু
রোগজীর্ণতা পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জার মধ্যে বাস
ক'রে গুরুতর কর্তব্যের ভারকে ভগ্ন উদ্যমের ফাটল দিয়ে
পথে পথে সে ছড়িয়ে দিতে থাকে, লক্ষ্যস্থানে অল্পই পৌঁছায়—"
—রবীন্দ্রনাথ

পরিচয়

জ্যৈষ্ঠ । ১৩৬৮

সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়


আধুনিক পরিবারে অভিনব সার্ফ
"আমিও ভেবেছিলাম এমন দিন আসুক..."
সমাজসেবিকা বোম্বের শ্রীমতী নোরেন অমলিক বলেন
'আর তা এসেওছে। সার্ফের কথাই ধরুন! আমি দেখেছি গৃহিনীরা এই আধুনিক কাপড় কাচার পাউডারটিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। সে ওতো এক অভিনব পরিবর্তন।'
'কারণ হলো সার্ফে কেচে, অনায়াসে শাড়ী, ব্লাউজ, সার্ট, প্যাণ্ট, ফ্রক, জামা, তোয়ালে, ঝাড়ন, ওয়াড়, চাদর—এক কথায় বাড়ীর সব কাপড় চোপড়ই ধব্‌ধবে আর ঝলমলে ফরসা হয়!" তাই আজ আধুনিক গৃহিনীরা সবাই একমত—সার্ফে কাপড় জামা সবচেয়ে ফরসা করে কাচা যায়। আপনিও কাপড়জামা বাড়ীতে সার্ফে কাচুন।
সার্ফে কাপড়জামা
সবচেয়ে ফরসা করে কাচে
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE CLEANEST WASH EVER!
SU. 17-X29 BG



'একটু আগে
জামাটা পরিয়েছি
— দেখুন কি দশা করেছে!'

"একটু আগে জামাটা পরিয়েছি, দেখুন কি দশা করেছে! এদের মতো দুষ্টুদের সামলাতে আপনাকেও কিন্তু আমার পথই বেছে নিতে হবে।"

"কাপড়জামা সবই সানলাইটে কাচুন। সত্যিই বলছি, কত কি ব্যবহার কোরলাম, কিন্তু সানলাইটের মতো এত ভাল করে কাপড় আর কোন সাবানেই কাচতে পারিনি। এতে কাপড়জামা মনের মতো ফরসা হয়, কেচেও আনন্দ!"

বোম্বের (২ না 'মে ফেয়ার, বান্দ্রা) শ্রীমতী আত্মারাম বাড়ীর সব কাপড়জামা বিশুদ্ধ, কোমল সানলাইটে কাচেন। আপনিও কাপড়ের আরও ভাল যত্ন নিতে সানলাইটে কাচুন।

সানলাইট



কাপড়জামার সঠিক যত্ন নেয়!

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

S. 29-X29 BG



দিনে দিনে নতুন রেক্সোনার পরশে ত্বকে নবীন লাবণ্য আসে



যতবারই মাখুন রেক্সোনার অবাক পরশ যেন প্রতিবারই আপনার ত্বকে নবীনতা এনে দেয়। ফেনিল রেক্সোনায় ক্যাডল আছে—বিশেষ ধরনের এই সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক তেলটি ত্বকের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যায় আর ত্বককে কোমল ও মসৃণ করে তোলে, চেহারায় আপনার লাবণ্য আনে।

মিষ্টি গন্ধ ভরা রেক্সোনা প্রতিদিন স্নানের পক্ষে আদর্শ সাবান। একবার মাখলে আপনি এর গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে পাবেন।



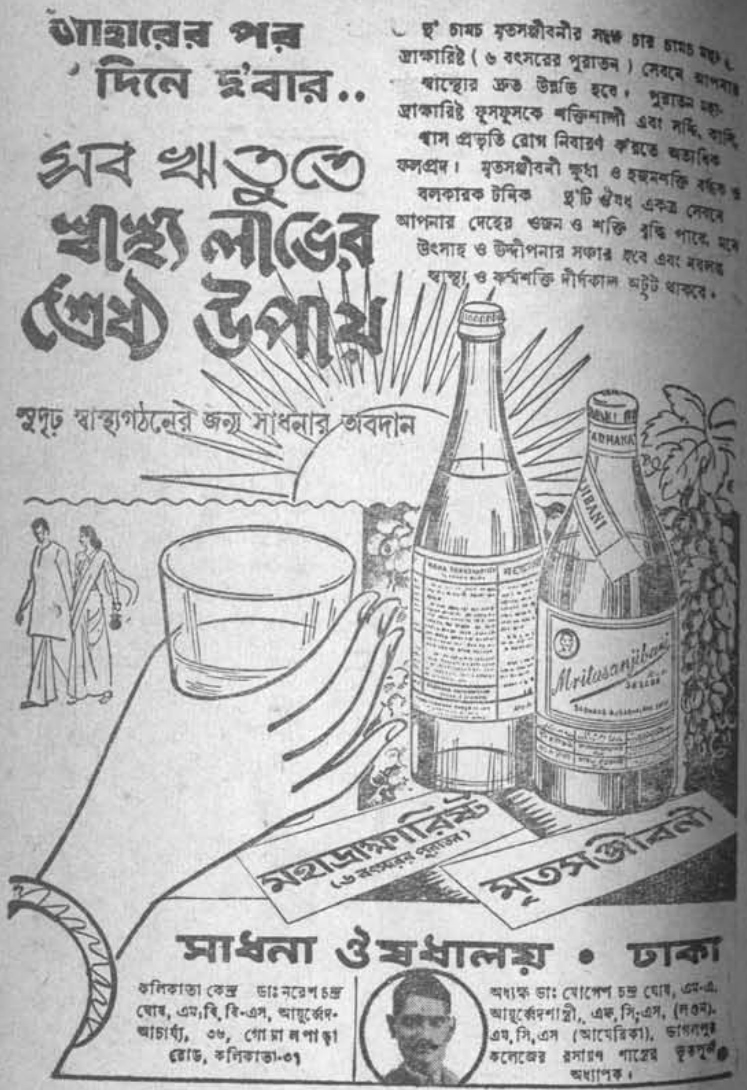


নতুন রেক্সোনার নতুন মোড়ক, নতুন আকার আর নবীন সবুজ রঙ আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

নতুন রেক্সোনা-ত্বকের সেরা যত্নের সহায়ক

R.P. 169-50 BG

ভারতে রেক্সোনা প্রোপাইটরী অষ্ট্রেলিয়া লিমিটেডের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরি



সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়

৩০ বর্ষ; ১১শ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৩ ; ১৩৬৮

কিউবার বিপ্লব

রণজিৎ দাশগুপ্ত

বাইবেলে রয়েছে, প্রবলপরাক্রমশালী বহুযুদ্ধবিজয়ী গোলিয়াথকে সামান্য এক তরুণ মেষপালক ডেভিডের কাছে চরম পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। অনুরূপ ঘটনাই সম্প্রতি ঘটেছে। ধনে-মানে-সামরিক বলে ধনতান্ত্রিক জগৎ-এর শীর্ষস্থানীয় উত্তর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে শোচনীয় বিপর্যয় বরণ করতে হয়েছে এই সেদিনের অখ্যাত অবজ্ঞাত কিউবার কাছে। মার্কিন সমর্থন ও সাহায্যপুষ্ট সামরিক আক্রমণ বিধ্বস্ত হয়েছে মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টায়। রীতিমত চমক দেওয়া ঘটনা।

কিন্তু এমন ঘটনা সম্ভব হল কেমন করে? মাত্র চৌষট্টি লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত ছোট্ট কিউবার শক্তির উৎস কোথায়? কেনই বা এই কিউবা-মার্কিন বিরোধ? কিউবার বিপ্লবটাই বা কি? কারা বিপ্লবী কিউবার বন্ধু, আর কারা শত্রু? কোথায় এই বিপ্লবের বিশেষ তাৎপর্য? কি এই বিপ্লবের ভবিষ্যৎ? এমনি নানা প্রশ্ন ও ঔৎসুক্য সকলের মনে। এ অবস্থায় কিউবার আলোড়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন স্বাভাবিক।

পশ্চাৎপদ অর্থনীতি

কিউবার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিবেচনার গোড়াতেই একটি বিষয়ে সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। তা হল, এই বিপ্লবের অভিনবত্ব অনেক দিক দিয়েই—কিন্তু বিপ্লবের প্রাথমিক কারণ ইতিহাসের যে কোনো গণ-অভ্যুত্থানের সদৃশ। অর্থাৎ পশ্চাৎপদ অর্থনীতি ও জনসাধারণের দুর্দশা।

লোকসংখ্যায় ও আয়তনে ছোট হলেও দেশটি অপূর্ব প্রাকৃতিক শ্রীমণ্ডিত, নানা প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে সুসমৃদ্ধ। অথচ কিউবার ভাগ্য বিড়ম্বিত। অর্থনীতির পশ্চাৎপদতা শোচনীয়। জনসাধারণ নিদারুণভাবে দরিদ্র, নিরন্ন, নিরক্ষর, রোগক্লিষ্ট।

জনসাধারণের এই দুর্দশা বোঝার জন্য একটিমাত্র তথ্যের উল্লেখই যথেষ্ট। মার্কিন দেশে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তীব্রতম অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে বেকারের সংখ্যা ছিল মোট জনসমষ্টির শতকরা পঁচিশ জন, আর বিপ্লব-পূর্ব কিউবার যে কোনো স্বাভাবিক বৎসরেই বেকারের অনুপাত ঐ শতকরা পঁচিশ।

প্রাক্-বিপ্লব কিউবায় আধুনিক শিল্পের বিকাশ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তামাক ও খনিশিল্পের সামান্য কিছু প্রসার ঘটে থাকলেও কার্যত চিনিশিল্পই ছিল সে দেশের একমাত্র শিল্প। দেশের মোট আবাদী জমির অর্ধেকেরও বেশিতে হত শুধু আখের চাষ। এ অবস্থায় কিউবার অর্থনৈতিক উত্থান-পতন এবং জনসাধারণের বিপুল অংশের জীবিকার প্রশ্নটি আখের চাষ ও চিনি শিল্পের প্রসার-সঙ্কোচনের সঙ্গেই প্রধানত যুক্ত ছিল। আর এই একটিমাত্র শিল্প ও ফসলের উপর নির্ভরশীলতাই ছিল কিউবার অর্থনীতির মূল দুর্বলতা।

জনসংখ্যার তুলনায় কিউবায় কিন্তু আবাদযোগ্য জমি প্রচুর। বিখ্যাত ফরাসী কৃষি-অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেনে দুমোর বিবেচনা অনুযায়ী, যথাযথ ভাবে চাষ করা হলে কিউবার পক্ষে পাঁচ কোটি লোকের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভবপর। অথচ বিপ্লবের আগে ওদেশে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হত তাতে মাত্র শতকরা সত্তর জনের সংস্থান হত, বাকী শতকরা ত্রিশ ভাগ জনসংখ্যার জন্য কিউবা আমদানীর মুখাপেক্ষী ছিল। অর্থনৈতিক সম্পদের অপচয় আর কাকে বলে?

এই পশ্চাৎপদতা ও দুর্দশাই কিউবার গণ-অভ্যুত্থানের আদি ও অকৃত্রিম কারণ। কিন্তু এই একটিমাত্র কারণই বিপ্লবের সাফল্যের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। কেননা ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের পরিস্থিতিও একই রকমের শোচনীয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও শোচনীয়। তথাপি কোন্ বিশেষ ঘটনাবলীর সমাবেশের ফলে এবং কেমন করে কিউবাতেই এই পরিস্থিতির প্রথম অবসান সম্ভবপর হল? মার্কিন অর্থনীতিবিদ স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল বারান সম্প্রতি এক আগ্রহোদ্দীপক আলোচনায় এ বিষয়ে অন্তত

আংশিক আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন (মান্থলি রিভিয়ু—জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১)।

ওয়াল স্ট্রীটের প্রভুত্ব

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই লক্ষণীয়, কিউবার উপরোক্ত অর্থনৈতিক অবস্থা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা কিংবা কিউবাবাসীর জাতিগত ত্রুটির পরিণতি নয়। এই মর্মান্তিক পরিস্থিতি কিউবা সম্পর্কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সচেতনভাবে অনুসৃত নীতির ফল, কিউবার অর্থনীতিতে ওয়াল স্ট্রীটের প্রভুত্বের পরিণাম। এবং অধ্যাপক বারান যথার্থই সিদ্ধান্ত করেছেন, এই মার্কিন আধিপত্যই প্রকারান্তরে কিউবার বিপ্লবের জয়ের পক্ষে অনুকূল উপাদানসমূহের অন্যতম। ওয়াল স্ট্রীটের নির্মম শোষণই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তীব্র অনুভূতি এবং ব্যাপকতম জাতীয় সমাবেশ ও ঐক্যের কারণ।

উত্তর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিউবার অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ। গত শতাব্দীতে কিউবা যখন দক্ষিণ আমেরিকার আরও অনেক দেশের মত স্পেনীয় উপনিবেশ ছিল তখন থেকেই কিউবার প্রতি মার্কিন শ্যেনদৃষ্টি। ১৮২৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কুইন্সি অ্যাডামস কিউবা গ্রাসের মতলব প্রকাশ করে লিখেছিলেন, স্পেনের সঙ্গে কিউবার সম্পর্কের অবসান ঘটলে কিউবা আমেরিকান ইউনিয়নেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। পরবর্তীকালেও মার্কিন কূটনীতিবিশারদেরা একই মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। "নিয়তির টানে কিউবা আমাদের। স্বাভাবিকভাবেই কিউবা আমেরিকান মহাদেশের"—সেনেটর স্টিফেন ডগলাস মার্কিন কংগ্রেসে ১৮৫৮ সালে এই ঘোষণা করেছিলেন।

কিউবাবাসীদের ধ্যান-ধারণা ছিল কিন্তু ভিন্ন। তারা স্বপ্ন দেখেছে স্বাধীন, সুখী, সমৃদ্ধ কিউবার। তারা এক-আধবার নয়, বারবার স্পেনের অধীনতাপাশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, স্বাধীনতার পতাকা তুলে ধরেছে।

কিউবার এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে মার্কিন জনসাধারণ তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি জানালেও সরকারী মনোভাব ছিল দ্বিধান্বিত। শেষের দিকে সামরিক সাহায্য অবশ্য এসেছে। কিন্তু এই সাহায্য পাওয়া গেছে ১৮৯৮ সালে। তখন দীর্ঘ তিন বৎসরের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ফলে স্পেনীয় বাহিনী প্রায় পর্যুদস্ত, স্বাধীনতা প্রায় সুনিশ্চিত। আর মার্কিন সরকারের এই

বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার আড়ালে ছিল সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ। সে অভিলাষের চরিতার্থতায় বিলম্ব ঘটে নি। স্পেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য-দানের জন্য যে মার্কিন ফৌজ এসেছিল সেই ফৌজেরই অধিনায়ক জেনারেল উডের নির্দেশে ১৯০১ সালের কিউবা-মার্কিন সম্পর্ক সংক্রান্ত চুক্তিতে "কিউবার স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে, জীবন, সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার উপযুক্ত সরকার গঠনের জন্য হস্তক্ষেপের অধিকার" মার্কিন সরকারকে দেওয়া হল। 'প্ল্যাট সংশোধন' নামে পরিচিত চুক্তির এই ধারাবলে কিউবার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব শূন্যে পর্যবসিত হল। এই চুক্তি-বলেই তিন-তিনবার—১৯০১, ১৯১২ ও ১৯১৭ সালে কিউবায় মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটেছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের শাসনকালে এই 'প্ল্যাট সংশোধন' নাকচ করা হলেও কিউবাবাসীদের পক্ষে এই সব হস্তক্ষেপের তিক্ততা বিস্মরণ সম্ভব হয় নি। আর আজও গুয়াতোমালে মার্কিন নৌ-ঘাঁটি পূর্বতন চুক্তির জের বহন করছে।

১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী বাতিস্তা সরকার পতনের আগে পর্যন্ত কিউবার সরকার—কিউবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন, কিউবার সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াল স্ট্রীটের স্বার্থে ও নির্দেশেই কিউবার সরকার গঠিত হয়েছে।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক জীবনে প্রভুত্ব নয়, কিউবার অর্থনীতিতেও ইয়াঙ্কি আধিপত্য ছিল অপ্রতিহত। গত শতাব্দীতেই কিউবার অর্থনৈতিক জীবনে মার্কিন পুঁজির যে অনুপ্রবেশের শুরু বিংশ শতাব্দীতে তার পরিণতি ডলার সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের বিস্তারে। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত মার্কিন সরকারের কমার্স ডিপার্টমেন্টের বিবরণী থেকে জানা যায়, "টেলিফোন ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি, জনকার্যে নিয়োজিত রেলওয়ের প্রায় পঞ্চাশ ভাগ এবং চিনি উৎপাদনের আনুমানিক চল্লিশ ভাগ" ছিল মার্কিন পুঁজির করায়ত্ত। কিউবার মার্কিন-ব্যাঙ্কসমূহ দেশের মোট ব্যাঙ্ক-আমানতের এক-চতুর্থাংশ পরিচালনা করত। আবাদী জমির চারভাগের তিন ভাগের মালিকানা ছিল দৈত্যাকার মার্কিন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের অথবা তাদেরই বশম্বদ ধনী কিউবাবাসীর কুক্ষিগত।

দেশের উৎপন্ন পণ্যসমূহের—এর অর্থ প্রধানত চিনি—কার্যত একমাত্র খরিদ্দার ছিল ইয়াঙ্কি বণিক; পক্ষান্তরে তারাই ছিল আবার বিদ্যুৎশক্তি-

খনিজ তৈল, খাদ্য, বস্ত্র, টেলিভিশন সেট, রেডিও, রেফ্রিজারেটার ইত্যাদি—কিউবার যাবতীয় প্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রী ও উৎপাদক দ্রব্যের একমাত্র জোগানদার। ক্রয়-বিক্রয় উভয়ক্ষেত্রেই দাম নির্ধারণে ইয়াঙ্কি কারবারীদের নির্দেশই হত চূড়ান্ত। রাজধানী হাভানা ছিল মার্কিন কারবারী, ভ্রমণকারী, জুয়াড়ী ও অন্য সব রকমের সমাজ-বিরোধীদের প্রমোদ উদ্যান। এবং এই সর্বময় আধিপত্যের দৌলতে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য শোষণের সুরঙ্গপথে কত ঐশ্বর্য যে সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধার অতল তলে তলিয়ে গেল তার হিসেব আর কে রেখেছে?

জাতীয় সংহতি

এহেন পরিস্থিতিতে কিউবাবাসীদের মনে যে উত্তর-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠবে তাতে আর বিস্ময় কি? বস্তুত কেবল তথাকথিত নিম্নশ্রেণীসমূহের কাছেই নয়, সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়গুলির কাছেও ইয়াঙ্কি প্রভুত্ব অসহনীয় ঠেকছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পবিকাশে আগ্রহান্বিত কিউবার ধনিকশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষাও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির শোষণে ব্যাহত হচ্ছিল। এ অবস্থায় মার্কিন উচ্ছিষ্টভোজী ও মার্কিন প্রভুদের মর্জিমাফিক ক্ষমতাভোগী মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী ভিন্ন কোনো কিউবাবাসীই দেশপ্রেমিক জাতীয় চেতনার বাইরে ছিল না। প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন ও দেশোন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তীব্র বিক্ষোভ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ধনিক, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী নির্বিশেষে সকল কিউবাবাসীর মধ্যে শুধু ব্যাপ্তই ছিল তা নয়, উপরন্তু উপরোক্ত চেতনাই কিউবার সকল শ্রেণী ও স্তরের জনসাধারণকে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে পরিচালিত ২৬শে জুলাইয়ের আন্দোলনের[১] প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন করে তুলেছিল, কিউবাবাসীদের দেশপ্রেমিক সম্মিলন সম্ভবপর করেছিল।

১। ১৯৫৩ সালের ২৬শে জুলাই কিউবায় বাতিস্তার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটে। ঐ তারিখে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে একদল তরুণ দেশপ্রেমিক কিউবার দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক দুর্গ আক্রমণ করেন। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। কিন্তু পরে কাস্ত্রো ও তাঁর সহকর্মীদের বিচারকালে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মর্মবাণী দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কিউবার জনসাধারণকে উদ্দীপিত করে। পরবর্তীকালে কিউবার বিপ্লব ২৬শে জুলাইয়ের আন্দোলন নামে অভিহিত হয়।

আর এই অবিভক্ত জাতীয় সমর্থন ও সংহতি যে কিউবার বিপ্লবের বিকাশ ও জয়ের পক্ষে সহায়ক হয়েছে তা তো সহজেই বোধগম্য।

বাতিস্তার দমনরাজ

মার্কিন-বিরোধী বিক্ষোভ ও অসন্তোষ চরমে উঠেছিল বাতিস্তার শাসন কালে। কেননা ফুলজেনিকো বাতিস্তার দমনরাজ ইয়াঙ্কিদেরই কীর্তি। আর বাতিস্তাশাসনের দুর্নীতি, স্বৈরাচার ও নিষ্ঠুরতার তুলনা ল্যাটিন আমেরিকার ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কুশাসনে অর্থনৈতিক বিপর্যয় আরও ব্যাপক, আরও তীব্র হল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে হিংস্র আক্রমণে মাত্র ছয় বৎসরে বলি হল কুড়ি হাজার দেশপ্রেমিক।

এই শোকাবহ পরিস্থিতিই বিপ্লবের প্রসারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করল। কারণ এই অমানুষিকতা ও অপদার্থতায় কিউবার সর্বশ্রেণীর সর্বস্তরের জনসাধারণের বিক্ষোভ শীর্ষে উঠল। এ বিষয়ে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীসমূহের প্রতিক্রিয়াই বিশেষ উল্লেখ্য। কেননা বাতিস্তার শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা বিত্তবানদেরও অনেককে বিপ্লবের সক্রিয় সমর্থকে পরিণত করল, অন্তত বিপ্লবী কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতাকে অনেকাংশে দূর করল। প্রকৃতপক্ষে কিউবার উচ্চশ্রেণীসমূহের এই সমর্থন ব্যতীত কাস্ত্রোর পক্ষে বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ—অর্থ, অস্ত্র, আশ্রয়, গোপন যোগাযোগ, খাদ্য, বস্ত্র—সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হত, বিপ্লবের অগ্রগতি ক্ষুণ্ণ হত। তদুপরি মধ্যবিত্তের এই মনোভাবের ফলেই বহুসংখ্যক ছাত্র, মধ্যবিত্ত তরুণ, অধ্যাপক, ডাক্তার, আইনজীবী প্রমুখ কাস্ত্রোর বিপ্লবী বাহিনীতে যোগদান করেছিল।

২৬শে জুলাইয়ের আন্দোলনের সাফল্য অর্জন প্রধানত বিপ্লবী বাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রামের ফলেই সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু বাতিস্তার পরাজয়কে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে সরকারী ফৌজের নৈতিক মনোবল ভেঙ্গে পড়া ও ব্যাপক দলত্যাগের গুরুত্ব হ্রাস করা কোনোভাবেই সম্ভবপর নয়—একথাটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই স্মরণের অপেক্ষা রাখে। সরকারী ফৌজের নৈতিক মনোবল ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ, একদিকে বাতিস্তার বিরুদ্ধে কিউবাবাসীর সর্বজনীন বিক্ষোভ, অন্যদিকে বিপ্লবের প্রতি ব্যাপক অকৃত্রিম সহানুভূতি। এই পরিবেশই মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত, আধুনিক সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত

সরকারী ফৌজের মনোবলকে একেবারে ভেঙ্গে দিয়ে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছে।

ফিদেল কাস্ত্রোর প্রতিভা

উপরে উল্লিখিত উপাদান দুটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তৃতীয় উপকরণ—ফিদেল কাস্ত্রোর প্রতিভা। সকলেরই জানা আছে, যে কোনো বিপ্লবী আন্দোলনের সফলতা নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও যোগ্যতার উপর একান্ত নির্ভরশীল। আর এর জন্য যে গুণাবলীর অধিকারী হওয়া নেতৃত্বের পক্ষে অপরিহার্য তার সবই কাস্ত্রোতে উপস্থিত। কিউবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মূলগত অসঙ্গতি সম্পর্কে প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টি, কিউবার সর্বাঙ্গীণ উজ্জীবনের কর্মসূচী বিষয়ে উপযুক্ত অনুভূতি, আবেগ ও পাণ্ডিত্যের একত্র সমাবেশ, অসামান্য সংগঠনী শক্তি ও অজেয় আশাবাদ, জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করতে পারার বিস্ময়কর ক্ষমতা এবং জনসাধারণের সৃজনশীল ভূমিকায় দৃঢ় প্রত্যয় কাস্ত্রোকে কিউবার অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করেছে।

এই ধনী জমিদার-তনয়ের রাজনৈতিক জীবনের শুরু একজন উদারপন্থী, গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক হিসেবে। গোড়ায় তাঁর লক্ষ্য ছিল স্বাধীন, গণতান্ত্রিক কিউবার প্রতিষ্ঠা, সেই সঙ্গে কিছু সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কার। কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কাস্ত্রোর দৃষ্টিভঙ্গী বেশি বেশি পরিবর্তিত হয়েছে, তাঁর চিন্তাধারা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে। কিউবার সমস্যাবলী অনুধাবনে তাঁর সততা, বিপ্লবের প্রতিটি পর্যায়ের প্রয়োজনানুগ নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্যের যথাযথ উপলব্ধি, বিপ্লবের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখার আবশ্যকতা সম্পর্কে চেতনা, জাগ্রত কিউবার প্রধান শক্তি, শ্রমজীবী জনসাধারণ—বিশেষত কৃষক ও শ্রমিকের সঙ্গে একাত্মতা এবং তাদের স্বার্থের প্রতি আনুগত্য কাস্ত্রোকে এক সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের নেতায় রূপান্তরিত করেছে।

সংগঠিত গণ-অভ্যুত্থান

বহু অনাচার-অবিচার, নির্মম লুণ্ঠন ও নিষ্ঠুর দমননীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে যে তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশে এবং ফিদেল কাস্ত্রোর রাজনৈতিক নেতৃত্বে তারই আগ্নেয় বিস্ফোরণ কিউবার বিপ্লব

কিউবার নিজস্ব স্বাধীন বিকাশের তাগিদে স্বতস্ফূর্তভাবেই এই গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছে, সঙ্কীর্ণ ছকে-বাঁধা ফর্মুলা অনুযায়ী অথবা গোপন ষড়যন্ত্রের ফলে আজ পর্যন্ত কোথাও কোনো গণ-অভ্যুত্থান ঘটে নি। কিউবার বিপ্লবও এই সাধারণ অভিজ্ঞতার কোনো ব্যতিক্রম নয়। এর মানে অবশ্য এ নয় যে আকস্মিকতার ফলে এ বিপ্লব ঘটে গেছে। বরং বিপরীতটাই সত্য। অর্থাৎ কাস্ত্রোর পরিচালনা, সচেতন রাজনৈতিক পরিকল্পনা, নিরলস প্রয়াস, ক্লান্তিহীন সংগঠন ও বহুজনের আত্মত্যাগের পরিণতি দীর্ঘ ছয় বৎসর ব্যাপী জয়-পরাজয়ে তরঙ্গায়িত উত্তাল আলোড়ন।

মধ্যবিত্তের বিদ্রোহ?

এই বিপ্লবের চরিত্র অবশ্য তর্কাধীন। অনেকে দাবি করছেন, কিউবার বিপ্লব মূলত তরুণদের, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের বিদ্রোহ। কেননা এরা এই ঐতিহাসিক আলোড়নের অংশীদার, নেতৃবৃন্দ তরুণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারজাত।

সন্দেহ নেই, এই বিপ্লবে মধ্যবিত্ত তরুণ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, অধ্যাপক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, আইনজীবী অন্যতম অংশীদার; কাস্ত্রো ও অন্যান্য নেতারা প্রায় সকলেই বয়সে তরুণ, জন্ম ও শিক্ষার বিচারে মধ্যবিত্ত।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় বিশেষ বিবেচনাযোগ্য। প্রথমত, কোনো প্রগতিশীল রাজনৈতিক আলোড়নেই মধ্যবিত্ত তরুণ ও বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা নগণ্য নয়। অতীতে বিভিন্ন দেশে নানা বিপ্লবে মধ্যবিত্তের সহানুভূতি, এমনকি সক্রিয় সহযোগিতা লক্ষণীয়। স্পষ্টতই এটা কিউবাবিপ্লবের কোনো অনন্য বৈশিষ্ট্য নয়। অতএব মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণের ঘটনাটিকে বিবৃত করাটাই কিউবার অভ্যুদয়ের চরিত্র-বিচারে যথেষ্ট নয়। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও তরুণবর্গ ইতিহাসের কোন্ বিশেষ ক্ষণে এবং কেন সক্রিয় হয়ে উঠল, কোন্ শক্তি সমাবেশের পটভূমিতে মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করল, কোন্ শ্রেণীবিন্যাসের পৃষ্ঠপটে এই আলোড়ন সার্থক হল—এসব প্রশ্নের আলোচনা ব্যতীত মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকা ও কিউবার বিপ্লবের মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তি বিশেষের শ্রেণীভূমিকা নির্ধারণে তার পারিবারিক পটভূমিকাটি জানা প্রয়োজনীয় হলেও যথোপযুক্ত নয়। অনুরূপভাবে, বিপ্লবের শ্রেণীপ্রকৃতি অনুধাবনে নেতাদের বংশতালিকা ও শিক্ষাজীবনের ইতিহাস

সম্পর্কে অবহিত হলেই চলবে না। এর জন্য, নেতাদের আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে তাঁদের অবস্থান জানা আবশ্যক। বিপ্লবের প্রধান শ্রেণীশক্তি কি? বিপ্লব প্রধানত কোন্ শ্রেণীর স্বার্থানুসারী? এমনি সব বিষয়ের যথাযথ পর্যালোচনার উপরই কিউবার আলোড়নের প্রকৃতি-নির্ণয় নির্ভরশীল।

কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে ও কেন মধ্যবিত্তশ্রেণী কিউবার বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল, সে প্রশ্নের আলোচনা একটু আগেই করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে এ-কথারও আভাস দেওয়া হয়েছে, কাস্ত্রো একজন উদারনৈতিক রাজনীতিবিদ হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে তাঁর কার্যকলাপ প্রধানত মধ্যবিত্ত তরুণ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নিজেই তাঁর জীবনের ও কিউবার আন্দোলনের এই সীমা অতিক্রম করেন। দেশের সকল নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনের অচ্ছেদ্য যোগ-সাধনে, শ্রমজীবী সাধারণের সঙ্গে সমস্বার্থবোধে, বিশেষত কৃষকের জীবন ও স্বার্থের শরিকানায় ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বের অসাধারণত্ব। ফলস্বরূপ কাস্ত্রোর সহকর্মীদের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিপ্লবের প্রকৃতি গভীরভাবে রূপান্তরিত।

বিপ্লবের এই পরিবর্তিত চরিত্র, দেশের সকল দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল শক্তির সম্মিলন এবং নিপীড়িত শোষিত জনসাধারণের বিপুল আলোড়নের বিশাল পটভূমিতে মধ্যবিত্ত তরুণ ও বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল বলেই তাদের প্রয়াস সার্থক। সুতরাং "তরুণরা তো নিশ্চয়ই, কিন্তু সর্বোপরি, শ্রমিক, কৃষক, ঔপনিবেশিকতার সকল শিকার, শোষিত সাধারণ" এই বিপ্লবের অংশীদার—কাস্ত্রোর এই মন্তব্যেই বিপ্লবের শ্রেণীচরিত্র সুপরিস্ফুট।

কৃষক-বিপ্লব

প্রকৃতপক্ষে এই ঐতিহাসিক আলোড়নের প্রধান চালক-শক্তি কিউবার campesinos অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ। জাঁ পল সার্ত্র, সিমন দ্য বোভয়া প্রমুখ অনেকে সম্প্রতি কিউবা-ভ্রমণ শেষে তাঁদের অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার আলোচনা প্রসঙ্গে এই অভ্যুত্থানকে 'কৃষক-বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য শুধুমাত্র 'কৃষক-বিপ্লব' রূপে এই চিহ্নিতকরণের যথার্থতা

তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু সে বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও একথা বস্তুতে বলা যায়, কৃষিসমস্যার যথাযথ উপলব্ধি এবং কৃষকের সোৎসাহ সমর্থন ও অংশগ্রহণ কিউবার বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তির মূল উৎস।

কিউবার জীবনে মার্কিন আধিপত্য এবং বাতিস্তার অপশাসন যেমন সমগ্র কিউবাবাসীকে অখণ্ড জাতীয় সংহতিবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তেমনি কিউবার গ্রাম্য জনজীবন বিন্যাসের বিশিষ্টতা কৃষকসমাজকে অভিন্নস্বার্থের দৃঢ় একতা-সূত্রে গ্রথিত করেছিল।

কিউবার জমির উপর নির্ভরশীল জনসমষ্টির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশ, প্রায় এক-চতুর্থাংশ, ছিল কোনো না কোনো ভাবে জমির মালিকানা ও স্বত্বের সঙ্গে যুক্ত—জমির মালিক, ভাগচাষী, প্রজা, অধস্তন প্রজা ইত্যাদি। গ্রাম্য জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তিন চতুর্থাংশই ইক্ষু, তামাক ও কফি বাগিচার শ্রমিক ছিল। এরা ছিল জমির মালিকানায় বঞ্চিত, উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের মালিকানার সঙ্গে সব রকম অর্থেই সম্পর্কহীন। মজুরির বিনিময়ে শ্রমশক্তি বিক্রয় করেই এদের জীবিকা নির্বাহ হত। নিজ মালিকানাধীন অথবা মালিকের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেওয়া খণ্ড বিচ্ছিন্ন জমিতে ব্যক্তিগত চাষের পরিবর্তে বিরাট বিরাট latifundia বা জমিদারিতে দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের অধীনে কর্মসংস্থান ও মজুরিশ্রমই ছিল এদের জীবনধারণের উপায়। এর অর্থ, কিউবার কৃষি অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্রের নানা চিহ্ন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এক ধরনের কৃষি-শ্রমিকের জন্ম ও বৃদ্ধি হয়েছিল। জাপান, মিশর কিংবা আমাদের দেশে অথবা বিপ্লব-পূর্ব চীন, পূর্ব-ইউরোপে যে ধরনের কৃষকসমাজের উদ্ভব হয়েছে, গ্রামীণ সমাজের অভ্যন্তরে যেমন নানা প্রকারের মালিকানা ও স্বত্বের বহু স্তরভেদ দানা বেঁধেছে, বিবিধ স্বার্থের সংঘাত দেখা দিয়েছে, কিউবার বিশেষ পরিস্থিতিতে তা ঘটে নি।

গ্রামীণ জনজীবনের উপরোক্ত লক্ষণ কিউবার কৃষক-সাধারণকে এমন এক ঐক্য ও সংহতি দান করেছে যা অন্য অনেক দেশে অনুপস্থিত। ফলে কিউবার গণ-অভ্যুত্থানে কৃষকসমাজের কার্যকারিতা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, আন্দোলনের আরও বিস্তৃতি, আরও গতিশীলতা লাভ করেছে, কৃষকের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ২৬শে জুলাইয়ের আন্দোলনের প্রকৃতি বেশি বেশি পরিবর্তিত হয়েছে, গণ-সংগ্রামের কর্মকৌশল এবং পরবর্তীকালে বিপ্লবী সরকারের কর্মসূচী মূলগত অর্থে প্রভাবিত হয়েছে।

ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবী আন্দোলনের কার্যক্রমে গ্রামীণ জনসাধারণের বিশিষ্ট স্থান প্রথম থেকেই ছিল। কৃষক ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণী "দুর্ভাগ্য কাকে বলে তা জানে। অতএব এরাই সীমাহীন সাহসের সঙ্গে সংগ্রামের উপযুক্ত"—একথা কাস্ত্রো ঘোষণা করেছিলেন ১৯৫৩ সালেই, ২৬শে জুলাইয়ের বিফল বিদ্রোহের পর বিচারকালে প্রদত্ত—'ইতিহাস আমাকে স্বীকৃতি জানাবে'—বিখ্যাত ভাষণটিতে গ্রামীণ জনসাধারণের এই বিপ্লবী ভূমিকা প্রকট হয়ে উঠতে শুরু করে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর থেকে—কাস্ত্রো যখন মাত্র এগারো জন সঙ্গী, বারোটি রাইফেল আর সামান্য কিছু গোলা-বারুদ ও রসদ নিয়ে সিয়েরা মেস্ত্রা পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বাতিস্তার ত্রিশ হাজার সুসংগঠিত ফৌজের বিরুদ্ধে এক অসমসাহসিক সংগ্রামে লিপ্ত হন। বস্তুত বাতিস্তার বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের প্রধান রূপ ছিল কৃষকের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সর্বাঙ্গীণ সাহায্যপুষ্ট, প্রধানত কৃষক-সন্তান নিয়ে গঠিত বিপ্লবী বাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম। কৃষকের এই বিদ্রোহ বাতিস্তার শোচনীয় পরাজয়কে অবধারিত করে তোলে।

অবশ্য সরকারী ফৌজের এই বিপর্যয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অংশ যে নগণ্য নয় তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অ-কৃষি শ্রমিকদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতার গুরুত্বও নিঃসংশয়ে স্বীকার্য। তথাচ বিপ্লবের সাফল্য অর্জনে গ্রামাঞ্চলে কৃষক অভ্যুত্থানের অবদানই প্রাথমিক ও মুখ্য। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ পল সুইজি, সাংবাদিক লিও হুবারম্যান (সুইজি ও হুবারম্যান : কিউবা—অ্যানাটমি অব এ রেভোল্যুশন), অধ্যাপক বারান প্রমুখ তাঁদের কিউবা ভ্রমণের পর অনুরূপ অভিমতই প্রকাশ করেছেন।

শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা

বাস্তবিক পক্ষে শহরাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণী অনেক দিন পর্যন্ত বিপ্লবী কার্যকলাপে বিশেষ সাড়া দেয় নি। এর কারণ অংশত কৃষিশ্রমিকদের তুলনায় চিনি শোধনাগার, খনি, পরিবহন, বন্দর প্রভৃতির কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা এবং সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব। সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে অবশ্য কিউবান কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব নেহাত সামান্য ছিল না। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি ছিল বেআইনী, ধড়পাকড়, গোপন রাজনৈতিক হত্যা ও তীব্র দমননীতির অন্যতম

প্রধান লক্ষ্য। অধিকন্তু, গোড়ার দিকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ২৬শে জুলাইয়ের আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উপযুক্ত বোঝাপড়া ও সংযোগের অভাবও ছিল। সব মিলিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয়তা বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল। অন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষত ১৯৫৮ সালের শেষ ভাগে অবশ্য তারা আগের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে। এই সময়ে বিপ্লবের জয়কে দ্রুততর করার ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণীর সভা-শোভাযাত্রা-বিক্ষোভ প্রদর্শন, বিশেষত ধর্মঘট সংগ্রামের ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কয়েক মাসেও কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর মনোভাব ছিল কিঞ্চিৎ সতর্ক, সংযত। একমাত্র গত বৎসরে ইয়াঙ্কি প্রতিষ্ঠান এবং কিউবান বৃহৎ কারবারসমূহ জাতীয়করণের পর থেকেই শ্রমিক-শ্রেণীর সক্রিয়তার মাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গীর গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। এখন তারা আর মালিককুলের মজুরিদাস নয়, আর বাইরের লোক নয়। বরং তারাই বর্তমানে এই সব প্রতিষ্ঠানের মালিক। এগুলির সংগঠন, পরিচালনা ও উৎপাদনসংক্রান্ত পরিকল্পনায় তাদের অধিকার স্বীকৃত। ফলে তাদের চেতনায় কাস্ত্রোর নেতৃত্বাধীন সরকার শ্রমিকদেরও সরকার। এ বিপ্লবের তারাই এখন উৎসাহী সমর্থক, প্রধান রক্ষক। এবং পরিণতিতে এই বিপ্লবের বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি সর্বহারা চরিত্রও দৃশ্যমান এবং বিকাশমান।

রাজনৈতিক বিপ্লব

এমনি করেই ২৬শে জুলাইয়ের আন্দোলনের ধারাবাহিতা অক্ষুণ্ণ, প্রগতি অপ্রতিবন্ধ। এই বিপ্লব কোনো এক জায়গায় ঠেকে থাকে নি, ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে এক পর্যায় থেকে পরবর্তী উন্নততর পর্যায়ে।

বিপ্লবের এই বিকাশ ও প্রকৃতি আলোচনাপ্রসঙ্গে লক্ষ্য করা প্রয়োজন, নিঃসন্দেহে এই বিপ্লব রাজনৈতিক বিপ্লব—কিন্তু কোনো মামুলি ধরনের রাজনৈতিক বিপ্লব নয়। ইতিহাসে রাজনৈতিক বিপ্লবের উদাহরণের অভাব নেই। ল্যাটিন আমেরিকায় তো হামেশাই বিপ্লব ঘটে। কিন্তু সেসব নেহাতই কিছু ভাগ্যান্বেষীর coup d'etat মাত্র। দেশের জীবনে সেসবের প্রভাব তুচ্ছাতিতুচ্ছ। আবার এমন শাসক পরিবর্তনও অনেক সময়ে ঘটে যা, আর কিছু না হোক, অন্তত আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক জীবন ও কাঠামোকে বেশ কিছুটা প্রভাবিত করে—দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাকিস্তানে আয়ুব খাঁর

সামরিক শাসন। আর হিটলারের অভ্যুদয়ও অন্য এক ধরনের রাজনৈতিক বিপ্লব। এর পরিণাম জার্মানির পক্ষে তো নিশ্চয়ই, এমনকি সারা দুনিয়ার পক্ষেও অত্যন্ত ব্যাপক ও শোচনীয় হয়েছিল।

কিন্তু এই সব রাজনৈতিক পরিবর্তনের নানা রকমফের সত্ত্বেও অন্তর্বস্তু অভিন্ন। এসবেরই লক্ষ্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের status quo বা স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা। উপরন্তু, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে, গণতন্ত্র-বিরোধী উপাদানসমূহকে, নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাবলীকে আরও জোরদার করা এই ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনসমূহের উদ্দেশ্য।

জাতীয়, গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক বিপ্লব

কিউবার আলোড়ন কিন্তু উপরোক্ত ধরনের রাজনৈতিক বিপ্লব নয়। এই বিপ্লব ঐ সবের থেকে মৌলিক অর্থেই ভিন্ন। কিউবার অভ্যুত্থান জাতীয়, গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক বিপ্লব। এই বিপ্লব কেবলমাত্র শাসক ব্যক্তি কিংবা দলের পরিবর্তনে সীমিত থাকে নি। এই অভুত্থানের প্রবল জোয়ারে ওয়াল স্ট্রীটের আজ্ঞাবহ শাসনের অবসান ঘটেছে, সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশী কায়েমী স্বার্থের পরিপোষক রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি নিশ্চিহ্ন হয়েছে, প্রতিটি অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাতিল হয়েছে।

বাতিস্তা, তার সামরিক পরামর্শদাতা, ফৌজ ও পুলিশের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গরা পলাতক হয় ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ কিন্তু এই সাফল্য অর্জন করেই থেমে যান নি। আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তনের আবশ্যকতা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদেরই নির্দেশে বাতিস্তার আমলের প্রশাসনিক সংস্থাসমূহকে নাকচ করে দিয়ে, মাকিন সামরিক মিশন বিতাড়ন করে, সৈন্য ও পুলিশবাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে, উৎপীড়কদের বিচারের ও শাস্তির ব্যবস্থা করে পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হয়। প্রাক্তন সরকারের সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করা হয়, প্রতিটি দমনমূলক আইন রদ করা হয়। সংক্ষেপে, অতীতের স্বৈরাচারী শাসনের আইন প্রণয়ন,

কার্যনির্বাহক এবং বিচারবিভাগীয় সংস্থাসমূহের পরিপূর্ণ বিলোপ ঘটিয়ে এক বহুদূর বিস্তারিত রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করা হয়।

সামাজিক বিপ্লব

কিন্তু এই রাজনৈতিক বিপ্লবের ব্যাপকতা ও সম্পূর্ণতাতেই কিউবান অভ্যুত্থানের পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে এই আলোড়নের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—এটি একটি সামাজিক বিপ্লব। রাজনৈতিক বিপ্লবকে অতিক্রম করে কিউবার সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোর আগাগোড়া রূপান্তর, উৎপাদন উপকরণসমূহের মালিকানা বন্দোবস্তের বিস্তৃত পরিবর্তন, শ্রেণীসম্পর্কের স্থায়ী, গভীর পরিবর্তন সাধনেই কিউবার বিপ্লবের সঙ্গে ইতিপূর্বে উল্লিখিত শাসনবদলের মৌল সীমারেখা। কিউবার এই ঐতিহাসিক আলোড়নের আসল মিল ফরাসী বিপ্লব, সোভিয়েত বিপ্লব কিংবা চীন বিপ্লব ইত্যাদির সঙ্গে। ইয়াঙ্কি একচেটিয়া পুঁজিপতি, বিশাল ভূসম্পত্তির দেশী-বিদেশী মালিক, চিনির বৃহৎ ব্যবসায়ী, আমদানী-রপ্তানীর কারবারী, কিউবান মুৎসুদ্দি—অতীতে এরাই ছিল কিউবার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বময় কর্তা। জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল অবহেলিত, শোষিত। কিন্তু কিউবার প্রচণ্ড সামাজিক বিস্ফোরণে আধা-উপনিবেশের পুরাতন জীর্ণ কাঠামোটি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ল, কায়েমী স্বার্থের আধিপত্যের অবসান ঘটল, প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীসমূহ নির্মূল হয়ে গেল। অভ্যুদয় ঘটল নবীন কিউবার। সামাজিক জীবনের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল নতুন অভিনেতা—সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের দল। প্রতিষ্ঠিত হল এ যুগের নায়ক—শ্রমিক ও কৃষক। শুরু হল কিউবার সর্বাঙ্গীণ উজ্জীবনের পালা।

কৃষি বিপ্লব : অঙ্গীকার পালনের নিদর্শন

বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই বাতিস্তা, অপরাপর প্রতিক্রিয়াশীল নেতা ও তাদের অনুচরবৃন্দের রাষ্ট্রীয় তহবিল লুণ্ঠন ও অন্যান্য অসদুপায়ে অর্জিত বিপুল ধনসম্পদ এবং অন্য সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণে সামাজিক বিপ্লবের শুরু। প্রথম কয়েক মাসে প্রতিক্রিয়াশীল ও দেশদ্রোহীদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি, বাগিচা, খনি, চিনি শোধনাগার ইত্যাদি জাতীয়করণ

রাষ্ট্র এই সবের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে। অবশ্য এই ব্যবস্থাগুলি একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। পরাজিত শত্রুর প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে এ সব ব্যবস্থা অভিনব কিছু নয়। সে সময়ে অনেকেই ভেবেছিলেন, প্রথম উত্তেজনা থিতিয়ে এলে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ সুস্থির হবেন। তাঁরা আর বেশি অগ্রসর হবেন না। তাঁদের কার্যকলাপ মামুলি কিছু রাজনৈতিক সংস্কারেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে অনেকে চিন্তা করেছিলেন। এমনকি এই পর্যায়ে আইসেনহাওয়ার সরকারও কিউবার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া আশা করেছিলেন। কিন্তু এঁরা সকলেই ভুল বুঝেছিলেন। এবং সে ভুল ভাঙ্গতে দেরি হয় নি।

যে ঘটনাটি ২৬শে জুলাইয়ের আন্দোলনের উদারপন্থী সমর্থকদের একাংশকে প্রথম বিচলিত করে, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে কিউবান বিপ্লবের প্রতি বিরূপ এবং সকল প্রতিক্রিয়াশীলদের মরিয়া করে তোলে তা হল কৃষি-সংস্কার, প্রচলিত কৃষি-ব্যবস্থার অতি ব্যাপক ও গভীর পরিবর্তন।

ফিদেল কাস্ত্রো ও অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের জানা ছিল, কৃষিবিপ্লব, কৃষি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন কিউবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। ছয় বৎসর আগের সেই 'ইতিহাস আমাকে স্বীকৃতি জানাবে' ভাষণটিতেই কাস্ত্রো জমির উপরে মুষ্টিমেয়ের মালিকানার অবসান ঘটিয়ে "কৃষক পরিবারসমূহের মধ্যে জমি বিতরণ" এবং "কৃষি সমবায় খামার বিকাশের" অঙ্গীকার করেছিলেন। এই অঙ্গীকার পালনে বিপ্লবী সরকার বিলম্ব করেন নি।

১৯৫৯ সালের মে মাসে ভূমিসংস্কার আইন গৃহীত হয়। মার্কিন প্রতিষ্ঠান ও মুষ্টিমেয় কিউবানের মালিকানাধীন জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা হয়, জমির একচেটিয়া মালিকানা চূর্ণ করা হয়। ভূমিসংস্কারের ব্যবস্থাবলী যথাযথ পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হল National Institute of Agrarian Reforms বা INRA। এই সংগঠনের উদ্যোগে জমি বণ্টন করা হল গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে, কৃষি-সংস্কারকে চালানো হল নতুন পথে, কৃষি-সমবায়ের পথে।

কৃষি-সমবায় আন্দোলন

কিউবার এই কৃষি-সমবায় আন্দোলনের দুটি স্বতন্ত্র অথচ পরস্পরের পরিপূরক রূপ। প্রথমত, কৃষক মালিকেরা সমবায় চাষব্যবস্থা গড়ে তুলেছে নিজেদের

মালিকানাধীন জমি মিলিয়ে। দ্বিতীয়ত, ভূমিহীন কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকেরা মিলিত হয়ে রাষ্ট্রের কাছ থেকে জমি নিয়ে রাষ্ট্রীয় কৃষি সমবায় খামার গঠন করছে। এই সমবায়ের সদস্যরা কাজের বিনিময়ে পায় বাঁধা মজুরি। রাষ্ট্রই এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর বৃহদাংশের মালিক। এই দুই ধরনের শত শত কৃষি সমবায় খামার গড়ে উঠছে লক্ষ লক্ষ কৃষকের সোৎসাহ সমর্থন ও সম্মতিক্রমে।

প্রশ্ন হতে পারে, এই সমবায় সংগঠন যে স্বেচ্ছামূলক তার প্রমাণ কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা যায়, কৃষিপণ্যসমূহের বিস্ময়কর উৎপাদনবৃদ্ধি প্রমাণ করে যে সমবায় সংগঠন কোনো জবরদস্তির ফল নয়, কৃষকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী নয়, বরং সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্প্রতিকালের এই উৎপাদনবৃদ্ধির নমুনা বর্তমান প্রবন্ধের অন্যত্র দেওয়া হয়েছে। আর কৃষকসমাজের কোনো ক্ষুদ্র অংশের প্রতিরোধ যে কৃষিউৎপাদনে কী বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে তা তো সোভিয়েত দেশে যৌথখামার আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত সকলেরই জানা রয়েছে।

কৃষি-সমবায়, এমনকি রাষ্ট্রীয় খামারের মাত্র দেড়-দুই বৎসরের মধ্যে অতি নির্ঝঞ্ঝাট বিকাশ অবশ্য অনেককে চমকিত করেছে, আবার অনেককে কিউবার বিপ্লবের প্রতি বিরূপ করে তুলেছে। কিন্তু কৃষি অর্থনীতির এই দ্রুত রূপান্তরের ব্যাখ্যা কিউবার কৃষকসমাজের বিশেষ বিকাশের মধ্যে নিহিত। পূর্বেই বলা হয়েছে, সে দেশে ধনী কৃষক, মাঝারি কৃষক ইত্যাদির নানা স্তরভেদ দানা বাঁধতে পারে নি। গ্রামীণ জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষিশ্রমিকের চেতনায় কোনো সময়েই ব্যক্তিগত মালিকানা-স্বত্বের ধারণা প্রখর হয়ে ওঠে নি, কৃষকের জমির জন্য সাধারণ মমতাবোধ ও বুভুক্ষা প্রবল হতে পারে নি। ফলে কৃষকমালিকানার কোনো মধ্যবর্তী পর্যায় অতিক্রম না করেই সরাসরি সমবায় কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভবপর হয়েছে। সমবায়ের প্রতিষ্ঠা স্বেচ্ছামূলক স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছে। এবং সেই আন্দোলনের প্রবলতায় কৃষি-অর্থনীতির প্রাচীন কাঠামোটাই অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।

অর্থনৈতিক সংগ্রাম

বিপ্লবী সরকারের কীর্তি একমাত্র ভূমি-সংস্কারেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। এই তরুণ সরকার কিউবার অর্থনৈতিক দেহে ডলার-সাম্রাজ্যবাদ ও আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার প্রায় শেষ চিহ্নটিকে পর্যন্ত নির্মূল করেছেন।

অবশ্য মার্কিন প্ররোচনাই কিউবার সামাজিক আলোড়নের বিস্তার বৃদ্ধিতে এবং উত্তরোত্তর radicalisation অর্থাৎ গণতন্ত্রীকরণ ও বিপ্লবীকরণে ইন্ধন যুগিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গত বৎসর মে মাস পর্যন্ত আমেরিকান প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরুদ্ধে প্রায় কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নি। তথাপি কৃষি-সংস্কারের ব্যবস্থাবলীই মার্কিন সরকার ও ইয়াঙ্কি কারবারীদের কিউবার বিপ্লবের প্রতি বিরূপ করে তোলে। আর বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মার্কিন দেশের উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস এবং সেই সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বাণিজ্য, বিনিময়, কারিগরী সহযোগিতা ও ঋণ সংক্রান্ত চুক্তির ফলে এই বিরূপতা তীব্রতর হয়। এবং জুনের প্রথমে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে খনিজ তেল এসে পৌছল তখন কিউবার তেলের বাজারে দীর্ঘ দিন ধরে কর্তৃত্বভোগী বৃহৎ প্রতিষ্ঠান তিনটি (জার্সি স্ট্যাণ্ডার্ড, শেল ও টেক্সাকো) ঐ তেল শোধনে অস্বীকার করল। বিদেশী কোম্পানীর এই ঔদ্ধত্য কিউবা সরকার বরদাস্ত করেন নি। এ অবস্থায় যে কোনো আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সরকারের পক্ষে যা করা অতি স্বাভাবিক কিউবা সরকার সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ ঐ সব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করে তেল শোধনে বাধ্য করা হল।

ফল স্বরূপ এই বিসংবাদ হল তীব্রতর। মার্কিন সরকার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন কিউবা থেকে চিনি ক্রয়ের বরাদ্দ বিপুল পরিমাণে হ্রাস করে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে কিউবায় মার্কিন বিনিয়োগের এক বিপুল অংশ, তেল শোধনাগার, চিনি শোধনাগার, বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান, টেলিফোন কোম্পানী, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি জাতীয়করণ করা হল। শর্তাধীনে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থাও রাখা হল।

আইসেনহাওয়ার সরকার আর এক দফা আঘাতের মতলব করলেন। ১৯শে আগস্ট কিউবায় প্রায় সব রকমের পণ্য রপ্তানীর উপর বাধা আরোপ করা হল, কার্যত কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ জারী করা হল। প্রত্যাঘাতে কিউবায় অবস্থিত অবশিষ্ট প্রায় সব কয়টি ইয়াঙ্কি প্রতিষ্ঠানকে

জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হল। মাত্র পাঁচ মাসের অর্থনৈতিক যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ওয়াল স্ট্রীটের অন্তত ষাট বৎসরব্যাপী আধিপত্য।

অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশ : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্ন

উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়ারই অঙ্গস্বরূপ ঐ একই সময়ে বিদেশী কোম্পানীর সহযোগী কিউবায় বৃহৎ কারবারসমূহ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, সঙ্কুচিত করা হয়েছে পুঁজিপতিদের মুনাফাশিকার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ সুযোগকে। বাড়ির মালিকদের প্রাপ্য খাজনা অর্ধেক করা হয়েছে, খর্ব করা হয়েছে একাধিক সম্পত্তির মালিকানার অধিকারকে। যে সব প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হয়েছে সেগুলিকে কেন্দ্র করেই গ্রহণ করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় ও পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নের কর্মসূচী।

এবং এই সব কিছুই ২৬শে জুলাইয়ের আন্দোলনের দুরন্ত বেগ ও অপরাধ সম্ভাবনার পরিচয়। স্বৈরাচার-বিরোধী, প্রগতিশীল, রাজনৈতিক বিপ্লব হিসেবে এই অভ্যুত্থানের শুরু। কিন্তু এই অভ্যুত্থান তার অন্তর্নিহিত বিকাশের নিয়মে, নিজস্ব গতির তাগিদে ঔপনিবেশিকতা এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সামাজিক বিপ্লবে পরিণত। এবং সেই সামাজিক বিপ্লবের দিগন্তরেখা ক্রমপ্রসার্যমান। ২৬শে জুলাইয়ের বিজয়ী আন্দোলন মাত্র আটাশ মাসে আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে উত্তরোত্তর উন্নততর স্তরে উত্তীর্ণ, এই আলোড়ন কৃষি-বিপ্লবের সফল সম্পাদনকে ভিত্তি করে, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের অবশেষকে উচ্ছেদ করে, অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ বেয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসরমান। সূচনা হচ্ছে কিউবার জীবনে এক নতুন যুগের।

কিউবার এই যুগান্তকারী রূপান্তরকে সুইজি, বারান এবং আরও কেউ কেউ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন। স্বয়ং কাস্ত্রো সম্প্রতি এই একই আখ্যা দিয়েছেন।[২] এমন অভিমতের কারণ বিবিধ। অবশ্য

২। ওয়াশিংটনের কর্তৃপক্ষ ও কিউবান প্রতিক্রিয়াশীলেরাও এই বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক, এমনকি কমিউনিস্ট বিপ্লব বলে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু এই চিহ্নিতকরণ স্থূল অভিসন্ধিমূলক। প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি ও তাঁর ধূর্ত পরামর্শদাতাদের জানা আছে, কিউবান অভ্যুত্থানের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, কায়েমী স্বার্থ-বিরোধী প্রগতিশীল দিকটিই যে তাঁদের গাত্রদাহের কারণ একথা প্রকাশ্যে কবুল করা অসুবিধাজনক। তাঁদের আরও জানা আছে, শুধুমাত্র ওয়াল স্ট্রীটের সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে পরিচালিত বিপ্লব-বিরোধী ষড়যন্ত্রে জনসমর্থন সংগঠিত করা

এমন ধারণা করার কারণগুলি সকলের ক্ষেত্রে অভিন্ন নয়। তবে সাধারণ-ভাবে কিউবার ঘটনাবলীতে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা, ফিদেল কাস্ত্রো, তাঁর ভাই রাউল কাস্ত্রো ও আর্নেস্তো গুয়েভারা প্রমুখ প্রধান বিপ্লবী নেতাদের মার্কসবাদী চিন্তাধারা সম্পর্কে আগ্রহ ও পক্ষপাত এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব ও ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তা বিবেচনা করলে উপরোক্ত অনুমান স্বাভাবিক। সর্বোপরি ধনতন্ত্রের অবাধ বিকাশ সঙ্কুচিত, এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ক্রমবর্ধনশীল।

কিন্তু এমন ধরনের নানা লক্ষণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কিউবার বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক কিংবা সাম্যবাদী আখ্যা দেওয়া অযথার্থ। কেননা ধনতন্ত্রের প্রসার সঙ্কুচিত হলেও এখনো কিউবায় উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকৃত। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর অতি ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়াস সত্ত্বেও উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূলোচ্ছেদ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন কিউবার বিপ্লবের আশু লক্ষ্য নয়। এখন পর্যন্ত এ বিপ্লবের প্রাথমিক ও মুখ্য কার্যক্রম পশ্চাৎপদ, আধা-ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে আধুনিক, শিল্পে অগ্রসর সমাজে পরিণত করা। অর্থাৎ মূলত এই বিপ্লব জাতীয়, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ল্যাটিফাণ্ডিয়া-বিরোধী, গণতান্ত্রিক বিপ্লব।[৩] সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সংযোগ এবং জাতীয় জীবনে কিউবান কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা প্রধানত এই বিপ্লবের সহায়ক শক্তি হিসেবে। কিউবার বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এই রূপান্তর ঘটছে ধনতন্ত্রের নেতিবাচক দিকগুলিকে যথাসম্ভব বর্জন করে, শোষণমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহকে যথাসাধ্য খর্ব করে, অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের

অসম্ভব। অতএব, গত পনরো বৎসরের ঠাণ্ডা যুদ্ধকালে অপপ্রচারের ফলে মার্কিন জনসাধারণের মনে যে কমিউনিজম-ভীতির সৃষ্টি হয়েছে তাকে ব্যবহার করা প্রয়োজন। কিউবায় সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও প্রতি-বিপ্লবের সাফাই গাওয়াটাই কিউবার ঘটনাবলীকে কমিউনিজম হিসেবে সনাক্ত করার উদ্দেশ্য।

আর এই চিহ্নিতকরণ যে সব রকম বিচারেই ভ্রান্ত তা বর্তমান প্রবন্ধের সমগ্র আলোচনার থেকে স্পষ্ট হবে। প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়, কাস্ত্রো বা তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের কেউই কমিউনিস্ট বলে জানা নেই।

৩। গত বৎসর আগস্ট মাসে হাভানায় অনুষ্ঠিত কিউবান কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ পপুলার সোস্তালিস্ট পার্টির সম্মেলনে পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্লাস রোকাসের প্রদত্ত রিপোর্টে বিপ্লব সম্পর্কে অনুরূপ বিশ্লেষণই করা হয়েছে (নিউ এজ [মান্থলি], ডিসেম্বর ১৯৬০)।

পথে। এই পথের সীমা-নির্দেশ অবশ্য এখনই সম্ভবপর নয়। কিন্তু এ পথ যে এক লক্ষ্মীমন্ত ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত, তা সুনিশ্চিত।

অর্থনৈতিক উজ্জীবন

অনেকের অবশ্য মনে হতে পারে, কিউবায় এসব যা ঘটছে তা বুঝি একদল অপরিণামদর্শী মাথাগরম ছোকরার কাণ্ড-কারখানা। কিন্তু কিউবার ধারাবাহিক অর্থনৈতিক অগ্রগমন এমন ধারণার অপ্রমাণ। অন্যান্য প্রয়াসের মধ্যে আখের উৎপাদন-ভিত্তিক এক-ফসলা কৃষি-অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনয়নে অতি অল্প সময়ে সফলতা এই অগ্রগমনের অন্যতম নিদর্শন। INRA-র পরিকল্পিত উদ্যোগে বিপ্লবোত্তর প্রথম বৎসরেই ধান, অন্যান্য শস্য, চীনাবাদাম ও বীনের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। অতীতে যেখানে তুলোর একেবারেই কোনো চাষ হত না, সেখানে ঐ এক বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৯ সালেই দেড় হাজার মেট্রিক টন তুলোর উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছে। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের এই প্রসার পরবর্তীকালেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে এর সবগুলিই ছিল কিউবার চিরাচরিত আমদানী পণ্য।

বাতিস্তার অপদার্থতার অন্যতম লক্ষণ ছিল বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেন-দেনের ব্যালান্সের সংকট ও বৈদেশিক মুদ্রাতহবিলের মজুত হ্রাস। কিন্তু বর্তমানে আর্নেস্তো গুয়েভারার সুদক্ষ পরিচালনায় লেন-দেনের ব্যালান্সের ক্রমোন্নয়ন এবং স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের মজুতবৃদ্ধি কিউবার অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির আর একটি নমুনা।

শিল্পোন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণেও বিলম্ব ঘটে নি। এক্ষেত্রে অবশ্য সমস্যা সুকঠিন ও জটিল। কারণ বিপ্লব-পূর্ব কিউবায় কোনো আধুনিক শিল্পই ছিল না। ফলে শিল্পায়নের কাজ শুরু করতে হবে একেবারে গোড়ার থেকে। কিন্তু কাজের দুরূহতায় কিউবা সরকার ভীত নন। পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়েছে। এবং সেই কমিশনের উদ্যোগেই আয়োজন চলছে ভারী ও মূল শিল্প সহ সর্বাঙ্গীণ শিল্পবিকাশের।

জনসাধারণের জীবনের উপর এই সব বহুমুখী প্রয়াসের প্রভাব ইতিমধ্যেই অনুভূত হচ্ছে। অবশ্যই তা বর্তমান পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। শ্রমিক ও কৃষক অর্থাৎ দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনযাত্রার মানের যে

উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে ও ঘটছে তা নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকার খ্যাতনামা কিংসলে মার্টিন (নিউ স্টেটসম্যান, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৬১) কিংবা সুইজি, বারান প্রভৃতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণী থেকেই জানা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৫৯ সালে শ্রমিকদের মোট মজুরি বৃদ্ধির হার ৪০ শতাংশ, বেকারের সংখ্যা হ্রাসের হার ৩৬ শতাংশ। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পেয়েছে, বাড়িভাড়াও হ্রাস পেয়েছে।

শিক্ষার সুযোগের বিপুল প্রসার, গৃহসমস্যার অভিনব সমাধান প্রয়াস উপরোক্ত ধারারই পরিচায়ক। প্রথম বৎসরটিতেই স্কুল ব্যবস্থার প্রসারের হার [illegible] শতাংশ, শিক্ষকের সংখ্যাবৃদ্ধি ৩০ শতাংশ। গোটা দেশ জুড়ে শত শত নতুন স্কুল গড়ে উঠছে, সামরিক ব্যারাকগুলি রূপান্তরিত হচ্ছে শিক্ষায়তনে।

গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের জন্য পৃথক দুটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা কার্যকরী হচ্ছে। হাজার হাজার আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত বাড়ি তৈরি হচ্ছে। শ্রমিক ও কৃষকেরা বাড়ির মালিকানা পাচ্ছে ভাড়ার পরিবর্তে সহজ কিস্তিতে—২০ কি ৩০ বৎসরব্যাপী মাসিক কিস্তি—মূল্য পরিশোধ করে।

বিপ্লবী আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ?

অবশ্য এমন লোকের অভাব নেই যারা স্বপ্ন দেখছে। বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই স্বপ্ন দেখে আসছে—কিউবার অর্থনীতি সংকট-গ্রস্ত, সে অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ছে। ভেঙ্গে পড়ছে সন্দেহ নেই, তবে তা হল অর্থনৈতিক সংকটের বড়ো সাধের স্বপ্নটি। উপরে উল্লিখিত তথ্যাবলীই একথার নিঃসংশয়িত প্রমাণ।

তা বলে 'মুক্ত দুনিয়া'র ভাড়াটে প্রচারবিদদের কিউবার বিপ্লবের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের বিরাম নেই, কুৎসা প্রচারে ক্লান্তি নেই। থিয়োডার ড্রেপার নামক এক মার্কিন সাংবাদিক রটনা করেছেন, বিপ্লবের আদর্শের প্রতি কাস্ত্রো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যে ব্যবস্থাবলে কৃষক জমির মালিক হল, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি ঘটল, বেকারের কর্মসংস্থান হল, চিনি শোধনাগার, খনি, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির মালিক হল জনসাধারণ, অতীতে যাদের অক্ষরজ্ঞানের সুযোগ ঘটে নি তারা স্কুলে যাচ্ছে, রোগে যাদের এক ফোঁটা ওষুধ মেলে নি

তাদের জন্য হাসপাতাল গড়ে উঠছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, দূর হয়েছে নিগ্রোদের বিরুদ্ধে বৈষম্য—'মুক্ত দুনিয়া'-র পরিভাষায় সে ব্যবস্থা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর খামখেয়ালপ্রসূত "জারজ ও নকল সমাজতন্ত্র।" অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু ড্রেপার সাহেব এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা কংগ্রেসের মুখপত্র 'এনকাউন্টার'-এর গত মার্চ সংখ্যার এক প্রবন্ধে।

এবং এমন আশ্চর্য জ্ঞান কিউবার জনগণের কাছে পরিবেশনের সুযোগ মিলছে না বলে এই ভদ্রলোকটি কিউবায় গণতান্ত্রিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার অভাবহেতু খেদ করেছেন। তিনি কাস্ত্রো সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী সংবাদপত্র দলনের অভিযোগ করেছেন। কিন্তু কিংসলে মার্টিনের বিবরণ থেকে জানা যায়, বিরোধী সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ ছাপাখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের বিপ্লব-বিরোধী পত্রিকার জন্য কোনো কাজ করে দিতে আপত্তি, সাংবাদিকদের লিখে দিতে অস্বীকৃতি এবং, সর্বোপরি, পাঠকের অভাব। আর কিংসলে মার্টিনকে পক্ষপাতদুষ্ট মনে করার কোনো কারণ নেই।

অতীতে কিউবায় নির্বাচন ছিল দুর্নীতিরই নামান্তর। যেহেতু সেই নির্বাচন এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নি, সুতরাং জনসাধারণের অশেষ যন্ত্রণা ও বেদনার মধ্য দিয়ে, বিপ্লবী সংগ্রামের আগুনে পোড়খেয়ে, বহু রক্তক্ষয় ও হাজার হাজার শহীদের জীবন উৎসর্গের ফলে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ড্রেপার ও তার সমগোত্রীয় লেখকদের গবেষণা অনুসারে, তা হল despotic, অগণতান্ত্রিক। কিন্তু কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ের মাঝ পথে, কোনো বিপ্লবের অগ্রগতিকে স্থগিত রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠান যে সম্ভবপর নয় এটা সহজেই বোধগম্য।

কিউবার জনগণের জন্য 'মুক্ত দুনিয়া'-র রক্ষকদের, প্রেসিডেন্ট কেনেডি থেকে শুরু করে ড্রেপার সাহেব পর্যন্ত সকলের মহা দুঃখ। কেননা কাস্ত্রোর টোটালিটারিয়ান ডিক্টেটরশিপের যাঁতাকলের তলে পড়ে কিউবার জনসাধারণ আর্তনাদ করছে। কিন্তু কোন্ টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রে কে কবে দেখেছে, স্থায়ী সৈন্য ও পুলিশবাহিনীর সংখ্যা ও গুরুত্ব হ্রাস করে militia বা সশস্ত্র গণবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে, প্রতিটি দেশপ্রেমিক তরুণ, প্রতিটি শ্রমিক যুবক, প্রতিটি কৃষক যুবা, শহর-গ্রামের প্রতিটি সুস্থ সবল ব্যক্তির হাতে অস্ত্র

তুলে দেওয়া হয়েছে? কিউবাতে অবিকল তাই ঘটছে। অথচ দেশের হাজার হাজার সাধারণ মানুষের হাতের এই অস্ত্র কাস্ত্রোর despotic regime-এর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় নি। এগুলি ব্যবহৃত হয়েছে কেনেডি সরকার কর্তৃক সংগঠিত বোম্বেটে আক্রমণের বিরুদ্ধে, ফ্লোরিডা, মিয়ামি ও গুয়াটেমালা থেকে আগত ভাড়াটে 'মুক্তি যোদ্ধাদের' বিরুদ্ধে। আর এই একটি ঘটনাই কিউবা-বিরোধী নির্লজ্জ নির্জলা মিথ্যার স্বরূপটিকে বিশ্বের জনগণের কাছে তুলে ধরেছে। প্রমাণ করেছে বিপ্লবী সরকারের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও আনুগত্য অবিচলিত।

অর্ধোন্নত দেশসমূহের পথ

কিউবার বিপ্লবের এই ক্রমান্বয়ে সাফল্য ও সর্বতোমুখী অগ্রগমনের তাৎপর্য সাময়িক বা স্থানিক নয়। কিউবায় যা ঘটেছে ও ঘটছে তার অভিজ্ঞতা আমাদের দেশের মতো অর্ধোন্নত, পশ্চাৎপদ সমাজের পক্ষে লক্ষণীয়ভাবেই প্রাসঙ্গিক ও শিক্ষাপ্রদ।

অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, আশ্রয়ের অভাব, কর্মসংস্থানের অভাব, শিক্ষাভাব, রোগে চিকিৎসার অভাব যে অর্ধোন্নয়নের লক্ষণ একথা কার না জানা আছে? আরও জানা আছে, যে কোনো অর্ধোন্নত অর্থনীতির জরুরী প্রয়োজন: গরিব ও ভূমিহীন চাষীর মধ্যে জমি বিতরণ, কৃষিসমবায় গঠন, কৃষিপদ্ধতির উন্নতি, ব্যাপক শিল্পায়ন, ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পের প্রতিষ্ঠা, বেকার ও আধা-বেকারদের কর্মসংস্থান, বাণিজ্য সম্পর্কের বৈচিত্র্যসৃষ্টি ইত্যাদি। জাতিসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞবৃন্দ, বিশ্ব ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কমিশন, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরাও উপরোক্ত প্রয়োজনসমূহ সম্বন্ধে একমত। অর্ধোন্নত দেশসমূহের রাজনৈতিক নেতারাও এবিষয়ে সচেতন। কিন্তু রোগ লক্ষণ, এমনকি রোগ নির্ণয়ের সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসার কার্যকরী ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য প্রচুর, জ্ঞান আর প্রয়োগের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। অন্য অনেক অর্ধোন্নত সমাজের নেতৃবৃন্দ যখন বাস্তব পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত, তখন কিউবার বিপ্লবের তাৎপর্য তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয়সাধনে।

কৃষি-বিপ্লবই যে কিউবার সমস্যাবলীর মর্মকেন্দ্র একথা কিউবার নেতাদের উপলব্ধিতে ছিল। কিন্তু শুধু এই জ্ঞান লাভেই তাঁরা সন্তুষ্ট হন নি। তাঁরা সদ্য প্রতিষ্ঠিত সরকারের শিশুত্বের দোহাই দিয়ে বা নানা জটিল সমস্যার

অজুহাতে কৃষি-সংস্কারে কালক্ষেপ করেন নি। তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের এ ব্যবস্থা দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপ কিংবা জোড়াতালি দেওয়া সংস্কারের ছিটে-ফোঁটা নয়, বরং দ্রুত, দ্বিধাহীন, প্রকৃত ভূমিসংস্কার। ফলত কৃষকসমাজের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ উন্মুক্ত, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনী শক্তির সীমাহীন প্রসার অবারিত।

অনুরূপভাবেই বিপ্লবী সরকার কিউবার অর্থনৈতিক জীবনে ওয়াল স্ট্রীট কিংবা বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যকে অপরিহার্য বিবেচনা করেন নি। শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মূলধনী দ্রব্য, কারিগরী দক্ষতা, নানাবিধ ভোগ্যপণ্য ইত্যাদির জন্য কিউবান অর্থনীতির পরনির্ভরশীলতা, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতার কথা কিউবান সরকারের থেকে বেশি জানা কারুর ছিল না। তথাপি নবীন কিউবার নেতারা নানা কূটযুক্তি ও তর্কের আড়ালে বিদেশী একচেটিয়া মূলধনকে আমন্ত্রণ জানান নি। ভিক্ষের ঝোলা হাতে নিয়ে ঘোরেন নি, শর্তকণ্টকিত মার্কিন সরকারী ঋণ ও খয়রাতির নাগপাশে বাঁধা পড়েন নি। বরং তাঁরা কিউবায় ডলার সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি অর্ধোন্নত দেশের সমস্যা মূলত অভিন্ন। প্রতি ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিকতার অভিশাপ, একদিকে, বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি, অপরদিকে, দেশীয় কায়েমী স্বার্থ সামাজিক অর্থনৈতিক প্রগতির কণ্ঠরোধ করে রয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা যে এ বিষয়ে অনবহিত তা মোটেই নয়। কিন্তু সমগ্র জাতির স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা এঁরা সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থের সেবায় বেশি আগ্রহান্বিত। রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত এঁরা গণ-আন্দোলনের নেতৃত্বদানে বাধ্য হলেও শ্রমিক-কৃষকের গণ-অভ্যুত্থানের সম্ভাবনায় সর্বদা আতঙ্কিত, সামাজিক বিপ্লবের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত। সে কারণে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের পর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পরবর্তী অগ্রগমন রোধ করে, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রসারের রাশ টেনে ধরে পূর্বতন শাসন ও পীড়নমূলক যন্ত্রটিকে যথাসম্ভব বজায় রাখার জন্য, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস-রফার জন্য, সামন্ততন্ত্র ও অন্যান্য স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আঁতাতের জন্য এই সব রাজনৈতিক নেতারা সতত সচেষ্ট। আর অর্থনীতির মূল কাঠামোগত পরিবর্তনসাধনে এই

দোদুল্যমানতা, উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা বন্দোবস্তের সংস্কারসাধনে এই অনিশ্চয়তা, সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের রূপান্তর আনয়নে এই শঙ্কাই এসব দেশে অর্ধোন্নতিকে জীইয়ে রাখার মৌল কারণ। পরিণতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনো কোনো দেশে একেবারেই অবরুদ্ধ, আর অন্য কোথাও সীমিত ও ব্যাহত। আমাদের দেশের গত তেরো বৎসরের ইতিহাস, কম-বেশি, এই একই ধারার পরিচায়ক।

কিউবার বিপ্লবের পথ কিন্তু উপরে উল্লিখিত ধারার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানকার নেতৃবৃন্দ দুর্দম গতিতে বিপ্লবের উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটিয়ে, যুক্তিসঙ্গত পরিণতির দিকে অগ্রসর করে নিয়ে গিয়ে, অতুলনীয় সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিটি বাধা ও প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রয়োজনানুগ কর্তব্যসম্পাদনে ব্যস্ত। তাঁরা কায়েমী স্বার্থের পরিপোষক রাষ্ট্রযন্ত্রকে চুরমার করে, বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে, আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার তিক্ত প্রতিরোধের পরাজয় ঘটিয়ে, ধনতান্ত্রিক বিকাশের যন্ত্রণাকে এড়িয়ে আনন্দোচ্ছল প্রাচুর্যে ভরা নতুন সমাজের নির্মাণকার্যে রত। অর্ধোন্নত দেশসমূহে প্রকৃত দেশোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উজ্জীবনের অপরিহার্য পূর্বশর্ত সামাজিক বিপ্লব, একথা কিউবার ঘটনাবলীতে সুপ্রতিপন্ন। আর এটাই কিউবার বিপ্লবের অন্যতম প্রধান শিক্ষা।

আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

কিন্তু এই বিপ্লব কেবলমাত্র অর্ধোন্নত, ঔপনিবেশিক সমাজের সমস্যাবলীর প্রসঙ্গে অর্থবহ নয়। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতির পৃষ্ঠপটে এই বিপ্লবের তাৎপর্য আরও বৃহৎ, আরও গভীর, আরও সুদূরবিস্তৃত। ২৬শে জুলাইয়ের আন্দোলনের এই জয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে দুনিয়াজোড়া বিশাল পরিবর্তনের প্রবাহে এক নতুন পর্বের সূচনা। এই ঘটনায় একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান, বর্তমানে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী অভ্যুত্থান শুধু এশিয়ায় বা এমনকি আফ্রিকায় আবদ্ধ নয়। সেই অভ্যুত্থানের দুর্বার গতিময় বন্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'পিছনের উঠোন' দক্ষিণ আমেরিকাও আজ প্লাবিত। আর সেই প্রবল প্লাবনের পুরোভাগে রয়েছে নবীন কিউবা। তার চাঞ্চল্যকর বিজয় অভিযানে ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের

মুক্তিকামী জনসাধারণ উদ্দীপিত, অনুপ্রাণিত। ফলে স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল, ইউনাইটেড ফ্রুট আর চিনি কোম্পানীর আধিপত্য বিপন্ন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কর্তাব্যক্তিরা আতঙ্কিত। আর তাই নবীন কিউবার অস্তিত্ব এদের কাছে অসহ্য। যেন-তেন-প্রকারেণ কিউবার বিপ্লবের অবসান এদের লক্ষ্য। কিন্তু নানা কারণেই এদের উদ্দেশ্যের সাধন বাধাপ্রাপ্ত।

অনেকের ধারণা, সামরিক শিক্ষা, লোক ও অস্ত্রবলের শ্রেষ্ঠত্বই যে কোনো যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের নির্ধারক। কিন্তু অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে উৎপীড়িতদের গণ-অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গে এ তত্ত্বটি যে অচল তার বহু দৃষ্টান্ত বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে রয়েছে। বাতিস্তার পরাজয় এবং এপ্রিলের হানাদারী আক্রমণের বিপর্যয় এই প্রাচীন সত্যের আর একটি নতুন উদাহরণ।

গত আটাশ মাসের কিউবা-মার্কিন সম্পর্কের ইতিহাসে আরও একটি সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের অসারতা বারেবারে প্রমাণিত হল। উত্তর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিপুল পরাক্রম ও ভৌগোলিক সান্নিধ্য হেতু দক্ষিণ আমেরিকার কোনো দেশে গণ-বিপ্লবের প্রয়াস বাতুলতামাত্র, এই তত্ত্বটি যে সাম্রাজ্যবাদেরই ভাড়া-করা লেখকদের একটি সুকৌশলী প্রচার ভিন্ন কিছু না তা নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত। আর ভৌগোলিক নিয়তিবাদের এই ফাঁপা বেলুনটি চুপসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকার দেশপ্রেমিক জনসাধারণের কাছে আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে কিউবার বিপ্লবী আদর্শ।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার সহযোগিতা

অবশ্য নবীন কিউবার অগ্রগতি, প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্তের পরাজয় এবং আমেরিকান আঘাত প্রতিরোধে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অস্তিত্বের তাৎপর্য অপরিমেয়। রাজনীতিগতভাবে, কিউবার প্রতি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নৈতিক সহানুভূতি, জাতিসঙ্ঘের বাইরে প্রতিটি গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সমর্থন বিপ্লবী জনগণ ও সরকারের মনোবল বাড়ানোর পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে, ইয়াঙ্কি কারবারীরা যখন কিউবাকে খনিজ তেল বিক্রয়ে অস্বীকৃতি জানিয়ে তীব্র সংকট ও চাপ সৃষ্টি করার চক্রান্ত করেছে, তখন তেল সরবরাহ করেছে সোভিয়েত রাশিয়া। মার্কিন সরকার চিনি

ক্রয়ের বরাদ্দ হ্রাস করে কিউবার দুর্বলতম স্থানে আঘাত করার মতলব এঁটেছে, অগৌনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি উন্মুক্ত করে দিয়েছে নিজেদের বাজার। মার্কিন সরকার অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করেছে, রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া নিশ্চিত করেছে উৎপাদক দ্রব্য, কাঁচা মাল, ভোগ্য পণ্য, কারিগরী বিশেষজ্ঞ, সুবিধাজনক শর্তে ঋণ ইত্যাদি সব কিছুর সরবরাহ।

সামরিক দিক দিয়ে, আধুনিক সমর উপকরণ—বোমারু বিমান, জঙ্গী বিমান, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের সরবরাহ আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা সৃষ্টি করেছে। আর সমাজতান্ত্রিক শিবির কর্তৃক কিউবাকে সক্রিয় সামরিক সমর্থন জ্ঞাপনের প্রতিশ্রুতি মার্কিন আক্রমণকে কঠিন করে তুলেছে।

ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত

এতৎসত্ত্বেও কিন্তু কিউবায় মার্কিন আক্রমণের বিপদ সম্পূর্ণ দূরীভূত একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং কেনেডি সরকারের প্রকাশ্য ঘোষিত নীতি —কিউবার বিপ্লবের ধ্বংসসাধন। অতএব সংশয়ের অবকাশ নেই, কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ও চাপ তীব্রতর করা হবে। ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলিকে উস্কানি দেওয়া হবে কিউবা আক্রমণের জন্য। গত দুবৎসরের মতোই ভবিষ্যতেও আমেরিকার মাটি, অর্থ, অস্ত্র ব্যবহৃত হবে কিউবান প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য। প্রত্যক্ষ প্রকাশ্য মার্কিন আক্রমণের প্রস্তুতিও চালানো হবে।

সুতরাং কিউবায় স্পেনের পুনরাবৃত্তি ঘটবে কি না—এ শঙ্কা কিউবার বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সকলের মনে। কিন্তু কিউবা আর স্পেন এক নয়। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক আর ষষ্ঠ দশকে মিল অনেক—কিন্তু অমিল আরো বেশি। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি—উভয়ই মূলগত-ভাবে স্বতন্ত্র।

কিউবার শত্রুরা আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার আশা পোষণ করছে। কিন্তু এ আশ যে মিছে ছলনা তা তো আগেই বলা হয়েছে।

অবশ্য কিউবাবাসীদের মধ্যে বিপ্লব-বিরোধিতার অভাব নেই। ফিদেল কাস্ত্রোর প্রাক্তন সহকর্মীদের কেউ কেউ রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন, বেশ কয়েকজন প্রতিবিপ্লবের শরিক হয়েছেন। কিন্তু এটা

অস্বাভাবিক কিছু নয় বরং এমন না হওয়াটাই আশ্চর্যের হত। কেননা যে কোনো সামাজিক বিপ্লবের ইতিহাসেই দেখা যায়, বিপ্লবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমর্থকদের একাংশ সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধিতে ভীত হয়, মধ্যপথাবলম্বীদের অনেকে সরে পড়ে, দোদুল্যমান অনেকে সরাসরি বিপ্লব-বিরোধিতায় শামিল হয়। কিউবাতেও এই নিয়মটির কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নি। মার্কিন জীবনযাত্রার ঢংয়ে যারা মুগ্ধ ছিল তারা কিউবা-মার্কিন সম্পর্কের গভীর বিচ্ছেদে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে। বাতিস্তা-বিরোধী আন্দোলনকে যারা 'প্রাসাদ বিপ্লব' বিবেচনা করে সমর্থন জানিয়েছিল তারাই ইয়াঙ্কি কারবার জাতীয়করণে, জমিদারির বাজেয়াপ্তকরণে এবং ব্যক্তিগত পুঁজির সঙ্কোচসাধনে, অর্থাৎ সংক্ষেপে ব্যক্তিগত সম্পত্তির 'পবিত্র অধিকার' লঙ্ঘনে প্রতি-বিপ্লবে যোগ দিয়েছে। এতে আর বিস্ময় কোথায় ?

কিন্তু বিপ্লবের ভাগ্য তো এরা নির্ধারণ করবে না, তা নির্ধারণ করবে শ্রমিক, কৃষক, নিগ্রো শ্রমজীবী, দেশপ্রেমিক তরুণ ও বুদ্ধিজীবী। এবং স্পেনের তুলনায় এঁরা আজ অনেক বেশি সতর্ক ও প্রস্তুত, এঁদের মিলন ও সংহতি অনেক বেশি দৃঢ়, রাজনৈতিক চেতনার মান অনেক বেশি উন্নত। গত এপ্রিলের প্রতি-বিপ্লবী ভাড়াটে বাহিনীকে এঁরা যেমন সংবর্ধনা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতেও এই ধরনের যে কোনো প্রয়াসকে এঁরা অবিকল অনুরূপ অভ্যর্থনাই জানাবেন। সুতরাং কিউবান প্রতিক্রিয়াশীলদের যে কোনো চক্রান্তই বিফল হতে বাধ্য।

অবশ্য সরাসরি মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কাকে নাকচ করা যায় না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার অভ্যুদয়, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্রমপ্রসার, সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির অনেকের ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী ভূমিকা, এমনকি খাস আমেরিকান মহাদেশে ব্রাজিল বা মেক্সিকোর সরকারের কিউবায় মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরোধিতার পরিস্থিতিটি ১৯৩৬ সালের আন্তর্জাতিক পটভূমির থেকে মূলত ভিন্ন। এই পরিস্থিতিকে কেনেডি সরকারের পক্ষে উপেক্ষা করা সহজ নয়। তথাপি যদি কিউবায় আমেরিকান সামরিক আক্রমণ ঘটে তবে তা ডলার সাম্রাজ্যের শেষ দিনকে নিকটতর করবে।

কেনেডি সরকার অবশ্য উপরোক্ত পরিস্থিতি এবং এপ্রিলের শোচনীয় বিপর্যয় থেকে নিকট ভবিষ্যতে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করবেন—এমন আশা ক্ষীণ। বরং তাঁরা উগ্রতর ব্যবস্থা গ্রহণের মতলব করছেন। স্বভাবতই এতে কিউবার শান্তিপূর্ণ গঠন-কার্য ব্যাহত হবে, সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাবলী জটিল হবে। কিন্তু অনুকূল আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিবেশে সকল বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে, শত্রুর ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে ২৬শে জুলাইয়ের আন্দোলনের মহৎ সঙ্কল্প ও সাধনা সার্থক হয়ে উঠবে—কিউবার বিপ্লবের অফুরন্ত প্রাণসম্পদ ও অজেয় শক্তির যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে এই আস্থা ও আশা পোষণ করার মতো কারণ আছে।

কবিতাগুচ্ছ

মাতাল-তরণী

(রবীন্দ্র-স্মরণে)

শেখ আবদুল জব্বার

আমার মাতাল-তরণী

মহাসমুদ্রে
তোমার তীরের আলোয় উদ্ভাসিত
হবে বলে ; নাচে অন্ধকারে একা, তরঙ্গের আবর্তে অস্থির

ধবল পালের রশ্মি মকর-চূড়ার মতো জ্বলে

মাঝে মাঝে—রুপোলি শীকরচ্ছটা লবনার্দ্র জলের কল্লোলে
গান হয়,
ফুল, বাণী, অনন্ত যাত্রার পথে
'নীলমণি' স্মৃতি

হিম-হাড় হাতের-মাস্তুল ব্যাপ্ত শূন্যে দোলে।

তীরহীন সমুদ্রের অবিশ্রাম-অন্ধকার-বন
তোমার ডাকের হাওয়ায় সাড়া দেয়—হাঙর, তিমির সাথে
রণ—
আমার যৌবন
অক্টোপাশের রক্ত মেখে লাল হতে চায়
প'রে নিতে বালার্ক বিন্দুর জয়টীকা—

মুখে তুলে কালের বিষাণ।

অজস্র নক্ষত্র-নাবিক সমুদ্রের গভীরে নেমেছে,
মগ্ন প্রবাল দ্বীপ 'পর, ফেনিল প্রাণের স্পন্দন
শুনে, খোঁয়ারিতে ব্রাত্য ছিন্ন করে সমস্ত বন্ধন

মাতাল, মাতাল আজ পথে শুক্তি, মুক্তোর মতো দেখে,

তোমার অজস্র উপস্থিতি

হাঁক দেয়, দাঁড় টান, দাঁড়—
এখনো সমুদ্রে ক্রুর সময়ের আদিম বিষণ্ণ অন্ধকার ;

আজ পারাপার চাই, আদিগন্ত, মথিত প্রাণের বেগে, হাজার হাতের ছন্দে
সমবেত জীবনের পাল তুলে
ঝড়ে,
জলোচ্ছ্বাসে, লক্ষপ্রাণের গানে কড়িতে, কোমলে কিম্বা ধৈবতের
বিপুল সত্তায়

দিক-দিন-দেশহীন সমুদ্রযাত্রার অবশেষ।

হে বিখ্যাত বিহঙ্গমা

তারাপদ রায়

কখনো পুষিনি পাখি, সোনা কিংবা বাঁশের খাঁচায়
কেমন মানায় পাখি, ছেড়ে দিলে ফিরে আসে কিনা
পরিচিত পরিপাটি পিঞ্জরের সাজানো বাসায়,
এই সব কৌতূহল কোনোদিন ছিল না ; জানি না।

এবং সোনার খাঁচা আজন্ম দুর্লভ বলে জানি,
পাখিও সুলভ নয় বৃক্ষহীন ধূসর নগরে
অনাহুত চড়ুইয়ের কিচিমিচি, উড়ো কানাকানি,
ক্ষণভাগ্যে দর্শনীয় অন্ধকার, ম্লান কোঠাঘরে।

ব্যর্থ পক্ষ বাতায়নে, নিরুদ্দেশ বদ্ধ গৃহদেশে
তথাপি উড়েছে পাখি স্বর্ণলেখা স্বচ্ছল পাখায়,
উজ্জ্বল উন্মুক্ত ঊর্ধ্বে, ঊর্ধ্বান্তরে দীপ্ত ভেসে ভেসে
নভনীলে, মেঘলোকে, রৌদ্রের প্রদেশে উড়ে যায়।

জানি সবই অনায়ত্ত, যা মিলেছে সাধ্যের সীমায়
কিছু তার অন্ধকার আর কিছু অমোঘ বাসনা ;
অব্যর্থ যৌবনে ডানা নিতান্তই প্রয়োজন, হায়,
হে বিখ্যাত বিহঙ্গমা, তবু তুমি এসো না, এসো না।

মায়ের কথা শুনবে বলে

অশোক মুখোপাধ্যায়

কতটুকু আর পথ, ভেবেছিলাম সূর্যের মুখ দেখতে দেখতে চলে যাব।

কারণ আমরা পৃথিবীর কণ্ঠ শুনতাম। বিশ্বাস করতাম অন্ধকার প্রাগৈতিহাসিক। এখন সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং জীবন।

তারপর ওরা দাবানল জ্বালল। চুষতে লাগল শিশুর হাড়। কত নারীর কাঁচা মাংসে লালসা পেল তৃপ্তি। রক্তের মেঘে আকাশ লাল হল। সবাই বলল, ওরা নাকি মায়ের কথা শুনবে।

আহা, কত অশ্রু, কত কাহিনী! ভেবেছিলাম সূর্যের মুখ দেখতে দেখতে চলে যাব। কারণ আমরা পৃথিবীর কণ্ঠ শুনতাম। বিশ্বাস করতাম অন্ধকার প্রাগৈতিহাসিক। এখন সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং জীবন।

একচক্ষু দানব অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, কই অন্ধকার কই! দেখছ না আমি আলো জ্বালিয়ে রেখেছি?

ইংরেজী নার্সারী রাইম

(ব্রেখ্‌ট্ থেকে অনুবাদ)

জিষ্ণু দে

যাদের পকেটে একটা পয়সা নেই
তারা কি করবে, বলবে?
মাটিতে গড়িয়ে কবরে ঢুকবে তারা,—
পৃথিবী যখন নিজের খেয়ালে চলবে?

অসম্ভব। ঐ আমাদের কোটি টাকা
জমবে না তবে, ওরা যদি পায় মুক্তি;
আমাদের মোটা সিন্দুক হবে ফাঁকা
যদি নাই পাই ওদের শ্রম ও শক্তি।

শেষলগ্ন

গুণময় মান্না

প্রত্যেক কর্মিষ্ঠ মানুষের মনে একটা অদ্ভুত ধরনের ক্লান্তিবোধ থাকে, বাইরের লোক সেটা বুঝতে পারে না। অমন জাঁদরেল রাষ্ট্রনৈতিক কর্মী বিনয় সমাদ্দারের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য : অন্তত এই মুহূর্তে, এই আসন্ন সন্ধ্যায় কলকাতার উত্তরে শহরতলিতে তাঁর বাড়ির দোতলায় জানালার ধারে দাঁড়ানো নিঃসঙ্গ, ক্লান্তমূর্তির দিকে তাকালে তাই মনে হয়। একটু আগে বিষণ্ণভাবে পায়চারি করছিলেন তিনি, তারপর সরে এসে ডান হাতে জানালার একটা শিক চেপে ধরে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছেন।

লোকে তাঁকে জানে আজীবন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ দেশকর্মী বলে: অসহযোগ আন্দোলনের সময় কলেজ ত্যাগ এবং কারাবরণ করে তাঁর দীক্ষা হয়েছিল দেশহিতের, তারপর ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেকটি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি, প্রয়োজনে আইনসভায় ঢুকেছেন, বেরিয়ে এসেছেন দলের নির্দেশে। তারপর একদা নেতৃত্বের অধিকার এসেছে তাঁর। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে মন্ত্রীত্বের পুরস্কার গ্রহণ করেন নি তিনি, এখনো জনজীবনের সঙ্গে তাঁর যোগ অবিচ্ছিন্ন, যেমনি অক্ষুণ্ণ তাঁর প্রভাব কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক দপ্তরে। লোকে জানে পঞ্চাশোত্তীর্ণ হয়েও এখনও তিনি সুঠাম, বলিষ্ঠ—দেহে ও মনে। আর, লোকের যেটা জানার কথা নয় সেটাও তারা জানে যে, তাঁর সেই অলঙ্ঘনীয় শক্তি আছে, যার দ্বারা তিনি বাইরে থেকেও নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন শাসন-যন্ত্রকে, নীতি-নির্ধারণের সময় মৌলিক পরিবর্তন না হোক, তার গতিমুখ বদলে দিতে পারেন প্রয়োজন মতো। লোকে এসব জানে, কিন্তু জানে না, ভেতরে ভেতরে তিনি কতখানি ক্লান্ত। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সমাদ্দার, 'হোআট্ আর অল দীজ্ ফর···মীনিংলেস !'

সামনে অস্তসূর্যের আলোতে তাঁর পরিচিত পাড়াটা অন্যরকম, বোধ হয় ঐ একই প্রকার অর্থহীন দেখাচ্ছে। খাল-খন্দ, খাটাল, খাপরার চাল আর প্রাসাদ সব এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। ঠিক কয়েক গজ দূরে তার

স্মৃতি-পরিচিত বড় নিমগাছটাও অর্থহীনভাবে পাতা দোলাচ্ছে। কেন, কে জানে।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সমাদ্দার শুনেও শুনলেন না, তেমনি করে পেছন ফিরেই রইলেন। সব সময়ই লোকজন আসছে: পাড়ার দুঃস্থ অনাথা মেয়ে ছেলের ওষুদ কিনতে পারে নি বলে সাহায্য চাইতেও আসতে পারে, মন্ত্রীসভারও হতে পারে কেউ। নিচের বসবার ঘরেও অপেক্ষা করে না, সেই পুরানো আমলের প্রথা চলছে। তাছাড়া, পৈতৃক আমলের এই ছোট্ট বাড়িটা পেয়েও তিনি গৃহহীন। নিঃসন্তান, বিপত্নীক সমাদ্দারের গৃহের অন্তঃপুরিক পবিত্রতার প্রয়োজন নেই !

সেই পায়ের শব্দ স্বাভাবিক দূরত্ব রেখে থেমে গেল না, একটু দ্বিধা করে একেবারে সমাদ্দারের পেছনে চলে এল। চমকে উঠলেন সমাদ্দার, পায়ের শব্দটা কাছাকাছি হতে না হতে তার সঙ্গে শাড়ির খসখস শুনতে পেলেন এবং ফিরে দাঁড়াবার আগেই তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সের অনতিসজ্জিতা, সুন্দরী, কুমারী এক মেয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল।

'তুমি ! অনু···' স্বতই কথা দুটি বেরিয়ে এল তাঁর থেকে।

'হ্যাঁ, আমিই তো, আর কেউ নয়···' অনুপমার উজ্জ্বল, কালো দৃষ্টিতে হাসি ঝিকিয়ে উঠল, আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এল ও।

'তা ঠিক, 'আর কেউ নয়···' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন সমাদ্দার, একটা চাপা বিদ্রূপ ঝলকে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আর এক কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলেন নিজেকে, 'দিস ইনইকোয়াল লাভ···এই অসম সংসর্গ ···ও এত ছোট···অল দিস ইজ্ মীনিংলেস !' একটু আগে তীব্র নৈরাশ্য আর ক্লান্তি বোধ করছিলেন তিনি, এখন বুঝলেন কারণটা রয়েছে এইখানেই। অথচ কথাটা আগে তাঁর একবারও মনে হয় নি।

'কি ভাবছেন ?' অনুপমার চোখের হাসিটা যেন সরে এসে তার পাতলা ঠোঁটের ওপর সকৌতুক অথচ নম্র ভঙ্গিতে ফুটে উঠল।

'তোমার কথাই···' তাড়াতাড়ি বললেন সমাদ্দার কিন্তু সত্যিই একটা আবিষ্ট মোহ অনুভব করছিলেন তিনি অনুপমার দিকে তাকিয়ে, যা অনেকবার নতুন করে অনুভব করেছেন তিনি, তাকে একান্তভাবে পেয়েও। ফিকে বাদামী রঙের সিল্কের শাড়ি পরে এসেছে অনুপমা কিন্তু সমাদ্দার জানেন সে কোনো দিন উগ্র সাজ-পোশাক করে আসে না: আটপৌরে ভঙ্গিতে দুটি

বাহু জড়িয়ে ঢেকে এসেছে ও, যার দিকে তাকালে ওকে অদ্ভুত নম্র মনে হয়। ঘাড়ের ওপর ঝোলানো এলোখোঁপায় একরাশ চুল বাঁধা পড়েছে, সমাদ্দার অনেকবারই বিস্মিত হয়ে ভেবেছেন ঐ ছোট্ট মাথাটির মধ্যে এত চুল ধরেছে কি করে। সত্যি, অনুপমার লম্বা-ছাঁদের মুখের ওপর ওর ছোট্ট মসৃণ কপাল, সমাদ্দারের মনে পড়ে ঐ কপালের ওপরই তিনি প্রথম চুম্বন দিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যতিক্রম, ওর পাতলা ঠোঁট দুটিতে অনতিলক্ষ্য হাসির রেখা, যা একই সঙ্গে নম্র, কিন্তু তীক্ষ্ণ, ঠিক ওর কালো উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টির মতো।

'আমি আসাতে আপনি খুশি হন নি···' ঠোঁট উল্টে বলল অনুপমা, ।কন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করেই ঢুকবার দরজার দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ও, 'আপনার কফি এসেছে...' বলতে বলতে।

'কফি ?' ভুরু কোঁচকালেন সমাদ্দার।

'হ্যাঁ, আমি রতনকে বলে এসেছিলাম···'

'না, বাবু, উনি নিজেই করেছেন, আমাকে আনতে বলেছিলেন···' বিছানার পাশে টেবিলের ওপর ট্রে-টা নামিয়ে রাখতে রাখতে নিরীহ মুখে রতন বললে। স্পষ্টত, এর কৌতুকটা বুঝতে পেরেছিল ও।

'হুম্···' রুষ্ট কিন্তু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সমাদ্দার ভৃত্যের দিকে তাকালেন: 'ও কি কিছু জানে ? আমাকে ঠাট্টা করতে চায়···' স্বতই কথাগুলো মনে এল তাঁর কিন্তু বুঝলেন, না, ওর চোখে কোনো কৌতূহল নেই। বরঞ্চ, সীমাহীন প্রশ্রয় আছে।

অনুপমা ততক্ষণে দেয়ালের আলমারি থেকে কাপ-ডিস বের করে এনে টেবিলের ওপর রেখেছে। চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে কোণা থেকে টুলটা টেনে আনলে অনুপমা, বিছানার বিপরীত দিকে বসে সমাদ্দারকে এসে বসতে বললে। রতনকে বললে, 'যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাও না, রতনদা ’

রতন দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যেতে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন সমাদ্দার কিন্তু অনুপমার ইঙ্গিত মতো বিছানার ওপর না বসে ওর পেছনে এসে দাঁড়ালেন। ডান হাতখানা রাখলেন ওর কাঁধের ওপর। অনুপমা ঈষৎ ঘাড় বাঁকাল কিন্তু ওর দিকে না তাকিয়ে চামচের চিনিটা কাপের ভেতর ঝুরঝুর করে ফেলতে লাগল। সমাদ্দার বললেন, 'আমি কফি খেতে ভালোবাসি সেটা তুমি ঠিকই জান। কিন্তু একটু আগেই আমি খেয়েছি, এখন আর খাব না···'

তিনি লক্ষ্য করলেন না অনুপমার মুখে একটা কালো ছায়া পড়ল। কিন্তু সে ধীরে ধীরে বললে, 'আমি চলে যাব ?'

সেই একই প্রশ্ন, সেই অভিমান। সমাদ্দার নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন মুহূর্তের জন্য: তাঁর সামনে কালো চুলের রাশি ওর ঘাড়ের ওপর কুণ্ডলীতে পড়ে রয়েছে, ওর থেমে-যাওয়া হাতের বালায় আর রুপোলী চামচেতে শেষ সূর্যের ম্লান আলো ঝিকিয়ে উঠেছে। ক্লান্ত স্বরে কেটে কেটে বললেন, 'তোমাকে চলে যেতে বলা আমার সাধ্যাতীত জেনেই তুমি একথা বলছ···কিন্তু সত্যিই যদি বলতে পারতাম!'

আবার দু-একটি মুহূর্ত কেটে গেল। সহসা সমাদ্দার ওর পেছন থেকে দ্রুত সরে এসে বিছানার ওপর ওর মুখোমুখি বসলেন, টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে। কফির কাপ টেনে নিতে নিতে বললেন, 'যাকগে, কি চাই বল তো, কি জন্যে এসেছ···'

বিস্ময়ে অনুপমার চোখ দুটি বড় হয়ে উঠতে গিয়ে হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেললে, 'কী দুষ্টু আপনি, সব বুঝতে পারেন···', তারপর আদর-প্রত্যাশী ভারী-ভারী গলায় বললে, 'সুশীলদা আপনার সঙ্গে এখনই দেখা করতে আসবেন।'

'সুশীলদা! মানে, আমাদের সুশীল মাইতি···কেন ?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সমাদ্দার ওর দিকে। তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করে খোঁচাবার ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি তাকে আসতে বলেছ নিশ্চয়ই। আমার কাছে ওর হয়ে ওকালতি করছ ?'

অনুপমা সোজাসুজি তাকিয়েছিল ওঁর দিকে। ওঁর কথায় নিশ্চিত ঈর্ষার সুরটা লক্ষ্য করেও করল না ও। একই রকম করে বললে, 'ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিম ইয়োরোপে যে ট্রেড্ ডেলিগেশন যাচ্ছে তার লীডার করে পাঠিয়ে দিন সুশীলদাকে।'

'আমি পাঠিয়ে দেব ? সেটা দিল্লী থেকে ঠিক হবে ··'

'না, যেখান থেকেই ঠিক হোক, আমি জানি আপনি ঠিক পারেন।'

অনুপমার আদুরে গ্রীবাভঙ্গির দিকে তাকিয়ে গা জ্বালা করে উঠল সমাদ্দারের কিন্তু তিনি সহজ, সকৌতুক হবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'আই ক্যান্ সেণ্ড এনিবডি টু এনিওয়ান অব হেল্স্, কিন্তু···তোমার দিক থেকে এই প্রার্থনা একটু বেশি রকম স্পর্ধার বিষয় হয় না কি ? সুন্দরী, কেন তুমি রাজনীতিতে মাথা গলাতে চাইছ ?'

দেখতে দেখতে ম্লান হয়ে এল অনুপমার মুখ, স্থির ভঙ্গিতে বসে রইল ও। তবু কেন জানি সন্ধ্যার এই আবছায়াতেও ওর পাতলা ঠোঁটের ওপর একটা হাসি অনতিলক্ষ্য রইল না। ও ধীরে ধীরে বিষণ্ণস্বরে বললে, 'আপনি আমাকে যে কোনো কটু কথাই বলতে পারেন, কারণ আমি সেটা অসম্মানের বলে মনে করব না। শুধু আমি কেন আমার সমস্ত পরিবার আজ আট-দশ বৎসর ধরে আপনার কাছে ঋণী। বাবাকে আপনি চাকরি দিয়েছেন… আমাকে স্কুলের থেকে কলেজে, ওরই মধ্যে মিউজিক কলেজে ভর্তি করেছেন… আজ যে আমি বেতার আর চিত্রশিল্পের নাম-করা গায়িকা, সে আপনারই দয়ায়। লোকে আমাকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে, কারণ তারা জানে আমি আপনার আশ্রিতা…তাই আপনার কোনো কথায় অসম্মানিত বোধ করবার অধিকার আমার নেই…'

'কি বলছ, অনু, লোকে জানে তুমি আমার আশ্রিতা, তার মানে কী?' কথার মাঝখানে ওকে থামিয়ে দিলেন সমাদ্দার।

বাইরে ভারী জুতোর শব্দ শোনা গেল, একটু পরেই টোকা পড়ল দরজায়।

'এই কি তোমার সুশীলদা?' সেই একই ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন সমাদ্দার, 'তোমার' কথাটার ওপর একটা অদ্ভুত মোচড় দিয়ে।

'হ্যাঁ…' উঠে দাঁড়াল অনুপমা, কিন্তু দরজা খুলে দেবার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না কারও। অনুপমা তার থামিয়ে দেওয়া কথাটা যেন সম্পূর্ণ করবার জন্যই বলতে লাগল—ওর স্ফুরিত মুখে বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে অভিমানের অশ্রু ঝিকিয়ে উঠতে চাইলে, 'তাছাড়া, আপনার কোনো আঘাতকেই আমি আঘাত বলে গ্রহণ করতে পারিনে, তার কারণ আমি আপনাকে…মানে…না, আমি কিছু বলতে চাইনে…' বলে মুখ ফিরিয়ে নিলে ও।

এবার হাসলেন সমাদ্দার, সে বড়ো কারুণ্যের হাসি। আবেগভরে তাড়াতাড়ি ওর কাছে এগিয়ে এসে ওর ডান হাতখানা তুলে নিলেন নিজের হাতে। তার পাতলা পাতলা আঙুলগুলি নিজের আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললেন, 'থামো, থামো, আর বকতে হবে না আমাকে…শোন, তুমি পাশের ঘরে অপেক্ষা কর একটু, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার…না-না, লক্ষ্মীটি, কথা শোন…' বলতে বলতে ওকে দুই দেয়ালের মাঝামাঝি দরজার দিকে নিয়ে গেলেন হাত ধরে। ঘরের ভেতর ওকে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ

করবার জন্য পাল্লা দুটো দুহাতে ধরে কোঁচকানো চোখে তাকালেন অনুপমার দিকে। অর্থপূর্ণ স্বরে বললেন, 'আমি জানি, রাজনীতিতে তুমি আসবেই এবং আমাকে তুমি হত্যা করবে…তা হোক, কিন্তু কোনো তরুণের প্রতি পক্ষপাত আমি স্বীকার করব না…' এবং উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে দরজা বন্ধ করে দিলেন, সুশীলের নামটা উল্লেখ করলেন না। তারপর ওখান থেকে সমস্ত মেঝেটা অতিক্রম করে এসে দরজা খুলে দিলেন সমাদ্দার এবং আগন্তুক ঘরে ঢুকতেই দরাজ গলায় বলে উঠলেন, 'আরে, এসো-এসো সুশীল, খবর সব ভালো তো?'

তিরিশ পেরনো যুবক সুশীল। লম্বা-হানো সুগঠিত চেহারা, তেমনি চোখা-চোখা মুখ-ভুরু-চিবুক, কেবল নাকটা একটুখানি চাপা। ও যখন প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল, তখন ওর মুখে একটা বিগলিত কিন্তু আয়ত হাসি ফুটে উঠেছে। ঈষৎ দৃশ্যমান ওর দাঁতগুলি অত্যন্ত শুভ্র, যা এই আবছা অন্ধকারে ওর সাদা ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে এক সুরে বাঁধা মনে হয়। বললে, 'আপনি তো আগেই কাজের কথা বলতে বলেন, তাই বলছি। দুটো কথা, সামনেই যে প্রভিন্সিয়াল কমিটির নির্বাচন আসছে সেই সম্বন্ধে…নিচের ঘরে মিঃ চোপরা বসে আছেন, কিছুতেই ওপরে আসতে চাচ্ছেন না আপনার পার্মিশন ছাড়া। আর, আমার নিজের একটা কথা, ওয়েস্টার্ন ইয়োরোপে যে ট্রেড ডেলিগেশন যাচ্ছে, তার জন্যে…'

ঘাড় নাড়তে লাগলেন সমাদ্দার, 'না, আজকে প্রথমে কাজের কথা নয়। বস আগে, কফি খাবে তো? ইউ, রতন…' হাঁক দিয়ে কফি আনতে বললেন নিচে থেকে, তারপর ভেতরে যেতে গিয়ে বললেন, 'সব সময় কাজের কথা ভালো না।'

দুই

মানুষ এমনিতে যখন ঘুরছে-ফিরছে, হাসছে বিষণ্ণ হচ্ছে, প্রসন্ন এবং রুষ্ট হচ্ছে, তখন তার মুখের চেহারা কি রকম হয় সে সম্বন্ধে কোনো খেয়ালই হয় না তার, কিন্তু ঠিক সেই মানুষই যখন আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সেটা অন্য রকম: তখন মুখের প্রত্যেকটা রেখা নিজের অজান্তেই সে নিয়ন্ত্রিত করে তোলে, তা সে তার তখনকার মনোভাব যাই হোক না কেন। বিনয় সমাদ্দারেরও ঠিক তাই হল। সুশীলকে চেয়ারে বসতে

বলে বোতাম টিপে আলো জ্বালালেন তিনি, সমস্ত ঘরটার আবহাওয়া মুহূর্তে বদলে গেল যেন। শুধু তাই নয়, সমাদ্দার যখন সুশীলের সামনে যেখানে একটু আগে অনুপমা বসেছিল সেখানে এসে দাঁড়ালেন তখন যেন তিনি সেই আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তখন তিনি প্রভিন্সিয়াল কমিটির সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান ব্যক্তি। শেষ প্রৌঢ়ত্বে এসেও যাঁর চেহারার স্বাভাবিক উন্নতি আর মহিমা তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। যাঁর বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে নানা উপদলীয় চক্রান্ত সত্ত্বেও যাঁর ভ্রূকুটিভঙ্গের মূল্য এখনও অপরিসীম। অথচ কী সাধারণ ভাব যেমন তাঁর গৃহ-সজ্জায়, তেমনি কোঁচা করে পরা আটপৌরে ধুতি আর গেঞ্জির পোশাকে।

কথাবার্তা হল প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। কথাবার্তা ঠিক নয়, একতরফা সমাদ্দারই বলে গেলেন। প্রথম দিকে সুশীল চেষ্টা করছিল ফাঁকে ফাঁকে নিজের কথাগুলো উপস্থিত করবার জন্য, কিন্তু একটু পরেই বুঝলে এখন তার কোনো কথাই তিনি শুনবেন না। চতুর সুশীল তৎক্ষণাৎ বুঝলে, তিনি ভেতরে ভেতরে বিহ্বল হয়েছেন, কারণটা সে অনুমান করেও করতে সাহস পেলে না।

'তুমি বলছিলে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে, বাট ইট হ্যাজ চেঞ্জেড ফর ওআর্স'... হাসতে হাসতে বলছিলেন সমাদ্দার। 'তবে তুমি যে বলছ আমাদের সেই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত সেটা মন্দ না। কথাটা বুদ্ধিমানের মতোই হল, হাঃ-হাঃ...' সমাদ্দারের মৃদু হাসি রূপান্তরিত হল উল্লম্ফিত পরিহাসে। তিনি ইতিমধ্যে বিছানায় বসেছেন আরাম করে টেবিলের ওপর দুই কনুই রেখে, আর দুইহাতের তেলো কখনও টেবিলের ওপর অলতো ভঙ্গিতে পাতছেন কথাবার্তার কোনো অংশে জোর দেবার জন্য, কখনও হাত দুটো আড়াআড়ি করে নিজেরই সুপুষ্ট বাহু জড়িয়ে ধরছেন ঠিক গেঞ্জির প্রান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে, তেমনি আলতো ভঙ্গিতে।

সুশীলের মুখে হাসিটা তেমনি আয়ত্ত হয়ে রয়েছে, কিন্তু চোখ দুটো কুঞ্চিত। সমাদ্দারের কাছে বসে থাকা তার কাছে অগ্নিপরীক্ষার তুল্য হয়ে দাঁড়াল: তিনি কাছে বসিয়ে তাকে যেন থাপ্পড় মেরে চলেছেন। সমাদ্দারের চোখে এইরকম জিঘাংসা এর আগে ও আর কখনও দেখে নি। কিন্তু ওর করবারও কিছু ছিল না, সমাদ্দারের সুগঠিত বাহুর দিকে তাকিয়ে

কথা শুনতে শুনতে তাঁকে খুবই বলিষ্ঠ, আর নিজেকে অসহায় বলে মনে হতে লাগল।

'জানো, সুশীল, আমরা আজীবন ফাইট করেছি, সেই যখন এতটুকু ছিলাম!' আবার দুই হাতের তেলো দিয়ে এতটুকুর পরিমাণ দেখালেন।—আমরা যা কিছু পেয়েছি লড়াই করে পেয়েছি। এখন আর আমাদের,... মানে, তোমাদের পুরুষে আর অর্জন করার দরকার নেই। এখন দেশ-বিদেশে সবাই বলে, নাও-নাও। হাত বাড়ালেই হল...পণ্য-বিনিময়, সংস্কৃতি-বিনিময়, উপহার-বিনিময়...সাহায্য-দান, খাদ্য-দান, কারিগরি-শিক্ষা, যন্ত্রপাতি...'

'বিনয়দা, আপনি বড় কড়া ক্রিটিক...'

সমাদ্দার কথাটা শুনেও শুনলেন না, চিবিয়ে চিবিয়ে বলে গেলেন, 'এখন তোমাদের সমস্যা হচ্ছে নট টু আর্ন, বাট হাউ টু রিসিভ! আরে, না-না, আমি 'তোমাদের' ডিসকারেজ করছি না...' চঞ্চল-হয়ে-ওঠা সুশীলকে থামিয়ে বললেন তিনি। 'আমরাই আসলে কী রকম হয়ে গেছি।...কেমন কনফেশানের মতো শোনাচ্ছে, না? যাক গে, তোমার খবর কি। তোমার নতুন বাড়ির সামনে সেই চিল্‌ড্রেনস্ পার্কটা তৈরি শেষ হল? যাব একদিন ওদিকে...আজ-কালের মধ্যেই যাব। আজ অনেক কথাই হল, আবার একদিন হবে, হ্যাঁ?'

স্পষ্ট বিদায় দিলেন সমাদ্দার। সুশীল আবার প্রণাম করে চলে যাবার সময় বুঝলে, এখানে কোনো সুবিধে হবে না। কিন্তু ওর মুখের হাসিটা তখন আর একটুও ছিল না, কে জানে ওর মন কোথায় কাজ করছিল তখন।

ও চলে যাবার পরও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইলেন সমাদ্দার। এতক্ষণ সমস্ত সময় ধরে যে কথাটা ভাবছিলেন তিনি, সেইটে যে উচ্চারণ করলেন বিড়বিড় করে, 'ওকে যদি ডেলিগেশনে পাঠাই তাহলে চোপরা গোষ্ঠীর বানিয়াদের খুব মজা!...মিঃ চোপরাকে সঙ্গে করে এনেছিল ও, কিন্তু ছোকরার স্পর্ধা কম নয়...'

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সমাদ্দার। তাঁর মনে হতে লাগল কুৎসিত, ক্লেদাক্ত কোনো কিছুর সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। ভেতরের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকালেন একবার, তারপর আলনা থেকে

পাঞ্জাবিটা টেনে গায়ের ওপর চড়াতে চড়াতে নিচে নেমে এলেন তিনি। রতনকে ডেকে বললেন, ‘ওপরের ঘরে দিদিমণি রয়েছেন, মিনিট পাঁচেক পরে গিয়ে বলো, বাবু বেরিয়ে গেছেন। আর শোনো, আমার ফিরতে রাত হতে পারে···’ বলে বেরিয়ে গেলেন অত্যন্ত নির্বিকারভাবে।

সমাদ্দার যখনই ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে পড়েন, তখন একসঙ্গে এক ঝাঁক জায়গা তাঁকে টানতে থাকে—প্রাদেশিক কমিটির অফিস থেকে আরম্ভ করে কোনো যুব-সমিতির অখ্যাত কার্যালয় পর্যন্ত। আজও তাই হল, বিশেষ করে একটু আগেই সুশীলের চোখে যে ধূর্ততা দেখেছিলেন, তার জন্য কয়েকটা জায়গায় যাবার কথা তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হল। কে জানে, ছোকরা কোথায় কোথায় কতদূর পর্যন্ত তার জাল মেলতে পেরেছে। কিন্তু কেন জানি ঠিক বিপরীত দিকে পা বাড়ালেন সমাদ্দার। মাত্র কয়েক মিনিটের রাস্তা, গঙ্গার ধারে এসে পৌঁছে গেলেন তখনই। একটা ভিখিরি ভিক্ষে চাইলে। পকেটে হাত দিয়ে ছোট্ট কি একটা মুদ্রা উঠল, দিলেন তার হাতে। এক সসন্তান দম্পতি তাঁকে পেরিয়ে গেল পাশে রেখে, মনে হল তারা যেন কি কেনা-কাটাও করেছে। হঠাৎ ওদের দিকে একবার ফিরে তাকালেন সমাদ্দার, মনে হল যেন ওদের চেনেন। ‘না, কোথাও দেখেছি হয়তো, কিংবা, আর কারুর মতো···’ ভাবলেন তিনি। এ রাস্তাটা ইতিমধ্যেই নির্জন। কিন্তু একটু পরেই পরপর একটা ঘোড়ার গাড়ি এবং লরি তাঁকে পেরিয়ে গেল। আরও একটু পরে দেখলেন, ছোট্ট একটা ভিড় জমেছে, রাস্তার পাশে। অদ্ভুত কৌতূহল বোধ করলেন সমাদ্দার, ভেতরে কে একজন (ভিখিরি নিশ্চয়ই) প্রসাদী সঙ্গীত গাইছে : মন তোর এত ভাবনা কেনে। একবার দ্বিধা হল তাঁর ; ‘এখানে আর কে চিনবে আমাকে, হিয়ার আই অ্যাম নো-বডি···’ পরক্ষণেই ভাবলেন তিনি, আর ভিড়ের মধ্যে গেলেন ঢুকে। বেশ লোকটা। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে গেছে, যতটা বুড়ো দেখাচ্ছে তত বয়স নয় ওর। গানের ঝোঁকে মাঝে-মাঝে চোখ বুজে আসছে। সমাদ্দার একবার পকেট হাতড়ালেন, একটা সিকি ঠেকল হাতে। কিন্তু ঠিক এখনই দিতে চাইলেন না, মুঠোর মধ্যে ধরে রাখলেন। যখন যাবেন দিয়ে যাবেন। লোকটা বেশ সতর্ক, এরই মধ্যে চোখে পড়েছে তাঁর হাতের দিকে। তা হোক, তবু লোকটাকে ভালো লাগল সমাদ্দারের। ওর স্বার্থচেতনা

ওর সহজ ভাবটাকে নষ্ট করে নি। কেমন জোরে জোরে খঞ্জনি বাজাচ্ছে ও। আশ্চর্য!

ওখান থেকে আরও উত্তরে চলে গেলেন সমাদ্দার, ক্রমে আরও নির্জন, পরিত্যক্ত মনে হল জায়গাটাকে। এখানে এর আগে এসেছেন কিনা মনে করতে পারলেন না। পথের ধারে গঙ্গার দিকে মুখ করে প্রথমে দাঁড়ালেন একবার, তারপর বসে পড়লেন। আলো-অন্ধকারে ঢাকা ওপারের ছবি ভেসে উঠল সামনে। ওপারে তীর-রেখা ধরে অসংখ্য আলোর বিন্দু, এতদূর থেকে কেমন অস্পষ্ট মনে হয়। কলকারখানার সারি। আধুনিক যান্ত্রিক জীবনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত, আলোড়ন-দ্বন্দ্ব স্বপ্নের মধ্যে যেন আচ্ছন্ন স্তব্ধতা লাভ করেছে।

আঃ! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সমাদ্দার। মধ্য-এপ্রিলের সিরসিরে নৈশ হাওয়া তাঁর সমস্ত দেহমনকে জুড়িয়ে দিলে যেন। এতক্ষণ পরে তিনি বুঝতে পারলেন, সত্যিই তিনি কতখানি ক্লান্ত হয়েছিলেন। পেছনের দিকে দু-হাত ছড়িয়ে দিলেন সমাদ্দার, নিঃশ্বাস নিলেন বুক ভরে। একটা শূন্য, অথচ আত্মতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে।

‘বল হরি, হরিবোল···’

হঠাৎ চমকে উঠলেন সমাদ্দার। ঠিক একেবারে পেছনে কয়েকজন লোক মড়া পোড়ানোর জন্য অতি দ্রুতবেগে এসে পড়ল এবং ঠিক তেমনিভাবে জায়গাটা পেরিয়ে গেল। চমকে উঠলেন সমাদ্দার। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটা যেমন নাড়া খেয়ে একবার ছিটকে গিয়েই আবার স্থির হয়ে ওঠে, তেমনি করে চমকটা কাটিয়ে উঠলেন তিনি কিন্তু বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। এ দৃশ্য তাঁর অচেনা নয়, নরস্কন্ধবাহিত বাঁশের দোলার ওপর সাদা কাপড়ে মোড়া শবদেহটা এই মুহূর্তে তাঁর কাছে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বলে মনে হতে লাগল। মানুষগুলো কাঁধে করে মৃতদেহটাকে বয়ে নিয়ে চলেছে!

আরো কিছুটা গিয়ে নদীর কোলে নেমে গেল লোকগুলো। সমাদ্দার এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নি, ওখানে দাউ-দাউ করে একটা চিতা জ্বলছিল। ওখানে যে ঈষৎ বাঁকের মুখে একটা ছোট্ট চড়ার মতো আছে, রাত্রিতে এত দূর থেকে তা বুঝবার উপায় ছিল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ওদিকে তাকিয়ে রইলেন সমাদ্দার। একবার তাঁর মনে হল, লোকগুলো উত্তর

দিকের কোনো ঘাটে মড়া পোড়াতে যায় না কেন? কিন্তু তারপরই সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে উঠল জেগে। এই চিন্তার অগ্নিজ্বালা ঠিক মানুষের অতৃপ্তি, আর অন্তর্দাহের মতো। মানুষের বুকের ভেতর এমনি সর্বনাশী ক্ষুধা হা-হা করে উঠছে আর এমনি করেই তার অবসান হয়। না, কিছুতেই কিছু হয় না। মানুষের জীবনের এই অসংখ্য মূঢ়তা, তার জ্বালা-যন্ত্রণা কোনো মতেই একটা পরিণামে আসতে চায় না, সব এমনি আকস্মিকভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে নিলেন সমাদ্দার। আবার তাকালেন নদীর ওপারের দিকে। কিন্তু একটু আগে তিনি যেন কী দেখেছিলেন, আর কিছুই দেখতে পেলেন না।

তিন

তার পরের দিন সন্ধ্যাতেই সুশীলের বাড়ি যাবার জন্য বেরোলেন বিনয় সমাদ্দার। অনেকবারই কথা দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ঠিক যাবার কথা মনে হয় নি তাঁর। সেটা ভবিষ্যতের জিনিস হয়েই ছিল। কিন্তু আজই তার ওখানে যাবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন তিনি।

কিন্তু তার বাড়িতে যাবার আগে আটকে গেলেন ঠিক তার বাড়ির পাশেই, চিল্‌ড্রেন্‌স্‌ পার্কে। এই পার্কের কথাই গতকাল বলছিলেন তিনি, সুশীলের চেষ্টাতেই পার্কটা গড়ে উঠেছে। তখনও কয়েকটি ছেলে-মেয়ে শেষ দফায় ছুটোছুটি করছিল ছোট্ট মাঠটার ওপর। সকৌতুক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাতে গিয়েই এক ভক্তি-বিনম্র অথচ উল্লসিত কণ্ঠে সম্বোধিত হলেন তিনি, এবং তারপরই সেই কণ্ঠের মালিক—পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়সের তরুণ যুবক সত্যরঞ্জন রায় ওঁর সামনে উপস্থিত হল। 'বিনয়দা, আপনি এখানে?'

'হ্যাঁ, তোমাদের পার্কটা কেমন হয়েছে দেখতে এলাম।'

'পার্ক দেখতে এলেন? এ পার্কটা না হলেই ভালো হত…' মুহূর্তে সত্যরঞ্জনের কণ্ঠস্বরের আদল বদলে গিয়ে সেটা তিক্ত, তীক্ষ্ন হয়ে উঠল। এবং বিরক্ত ভঙ্গিতে ও তাকাল পার্কের পাশেই সুশীল মাইতির নতুন, দোতলা বাড়িটার দিকে।

'হঠাৎ?'—সমাদ্দার পার্কটার চতুঃসীমার ওপর চোখ বুলোচ্ছিলেন

আলতো করে, ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার…', পার্কের ভেতরে ঢুকে পড়লেনও তিনি।

যে গুটিকয়েক ছেলেকে খুবই পছন্দ করেন সমাদ্দার, তাদের মধ্যে সত্যরঞ্জন অন্যতম। ছোকরার চেহারা যেমন ঢ্যাঙা, নলখাগড়ার মতো, বুদ্ধিও তেমনি তীক্ষ্ন। ওর সঙ্গে দেখা হলে কারও না কারও সম্বন্ধে ও কথা বলবে, এবং সে কথাগুলি প্রায়শই হুল ফোটানোর জন্য। অপ্রিয় কথা যতই তীব্র হোক, সেটা যদি আদৌ সঙ্গতিযুক্ত হয় আর নিজের সম্বন্ধে না হয়, তাহলে মানুষের ভালোই লাগে। সমাদ্দারও তার ব্যতিক্রম নন। বিশেষ করে সত্যরঞ্জন ভক্ত, সমাদ্দার সেটা জানেন বলেই তাকে প্রশ্রয়ও দেন।

ও সমাদ্দারের প্রশ্নে একটু বিস্মিত হল যেন, বললে, 'ব্যাপার কিছু নয়, কেউ যদি জনহিতের নামে নিজের হিতটা আগে দেখেন তাহলে জিনিসটা একটু গায়ে লাগে না কি?'

'কি রকম…' মৃদু হাসলেন সমাদ্দার, তাঁর দৃষ্টি তখন পার্ক থেকে সরে গিয়ে সুশীলের বাড়িটার ওপর পড়েছে।

সত্যরঞ্জন বুঝলে তার আক্রমণটা আরও সোজাসুজি হওয়া দরকার, তার কথাগুলো সমাদ্দারকে এখনো স্পর্শ করে নি। ওর গলার স্বর বদলে গেল মুহূর্তে, নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বললে, 'এই দেখুন না, এই পার্কের কথাই ধরুন…জায়গাটার খদ্দেরও জুটেছিল কিনবার জন্যে, কিন্তু সুশীলদা মিউনিসিপ্যালিটিকে বোঝালেন, এ পাড়ার শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা পার্ক দরকার, টাকা আনলেন এখান-ওখান থেকে…কিন্তু বিনয়দা, যদি পার্কটা না হয়ে এখানে বাড়ি উঠত, তাহলে সুশীলদার বাড়ির সামনেটা বন্ধ হয়ে কী হত বলুন দেখি…'

'বেশ, বেশ। সুশীল তো খুব বুদ্ধিমান, আর তুমি তার থেকেও…'

সত্যরঞ্জনের একটু অভিমান হল। বললে, 'আপনারা দেখেও দেখেন না, আমরা কিছু বললে সেটা হয় ছেলেমানুষের মুখে পাকা কথা। সুশীলদা ওয়েস্টার্ন ইয়োরোপে যাচ্ছেন, জানেন আপনি?'

'মানে…' ফিরে দাঁড়ালেন সমাদ্দার। ছোকরা কি বলতে চায়?

মুহূর্তের জন্য বুক কাঁপল সত্যরঞ্জনের, ভাবলে উনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু এই ভয়টাই ওর ঢ্যাঙা চেহারায় একটা দৃঢ়তা ফুটিয়ে তুললে

যেন : 'আর এই ট্রেড ডেলিগেশনের ফল কি হবে জানেন? কলকাতা আর বোম্বের চোপরা-গোষ্ঠীর একটা বিরাট সুবিধা হয়ে যাবে। আপনি জানেন সবই…'

'স্ট্রেঞ্জ! এসব কথা তুমি জানলে কোথা থেকে?' সমাদ্দারের চোখ মিটমিট করতে লাগল।

'কেন, সুশীলদা নিজেই বলেছেন আমাদের, অবশ্য চোপরা-প্রদর্শনী বাদ দিয়ে…'

'তার মানে, সেটি তোমার উর্বর কল্পনা-শক্তি থেকে উদ্ভূত। আর তোমরা বুদ্ধিমানেরা এত বেশি বোঝ কিন্তু এইটে বোঝ না যে ঐ রকম একটি গোপন অভিসন্ধি থাকলে সেটা গোপনেই থাকত।'

হেসে উঠল সত্যরঞ্জন, অবিনয় হবে জেনেও। 'বিনয়দা, মানুষ একবার বেহায়া হয়ে উঠলে চক্ষুলজ্জার বালাই থাকে না। অন্যে জানলেই বা কী, বিশেষ করে যদি জানা থাকে যে প্রতিবাদ করার কেউ নেই!…এই যে অনুদি, আসুন…' (স্পষ্টত, ডাকটাতে সম্ভ্রম ফুটে উঠল, অনুপমা ওদের অনেকের থেকে বয়সে ছোট হলেও অনুদি নামেই সম্বোধিত)।

রাস্তা থেকে নেমে কখন একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছিল অনুপমা, এরা কেউ বুঝতে পারে নি। কিন্তু যেমনি নীরবে এসেছিল, তেমনি মুখর হয়ে হেসে উঠল ও। 'কি কথা হচ্ছিল, শুনি…'

'আচ্ছা, অনুদি, আপান বলুন তো, সেদিন সুশীলদা নিজেই আমাদের কাছে ইয়োরোপ যাবার কথা বলেন নি?'

অনুপমার কণ্ঠস্বরে আর গ্রীবাভঙ্গিতে লাস্যের হাসি ঝিলিকয়ে দিয়ে উঠতে চাইলে যেন, 'ওঃ, আমি বলি কি না কি…'

উচ্ছল আকাশে হাল্কা মেঘের আবরণ পড়লে যেমন অন্ধকার না হয়েও আবহাওয়াটা দেখতে দেখতে গুমোট হয়ে ওঠে, তেমনি ভেতরে ভেতরে ঘামতে আরম্ভ করলেন সমাদ্দার। চকিতে পরপর কয়েকটা কথা ওঁর মনের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। ভাবলেন, অনুপমা সুশীলদের বাড়ি যাবার জন্য বেরিয়ে এসেছিলেন, এখানে তাঁকে দেখতে পেয়ে নেমে এসেছে। অনুপমার এই অকারণ, উচ্ছল লাস্য সত্যরঞ্জনকে মাঝখানে রেখে তাঁকেই অপমান করবার জন্য। ভাবলেন, এখনই তাঁকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। যে সত্যরঞ্জনের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলতে গিয়ে একটা মেজাজ অনুভব করছিলেন

তিনি, সেই তারই মুখের দিকে আর তাকাতে পারলেন না। ওর কথা থেকে যদিও বুঝলেন, তাঁর প্রতি সত্যর তখনও কোনো অবিশ্বাস নেই এবং সেকাল চোপরাকে সঙ্গে করে সুশীল তাঁর বাড়ি গিয়েছিল তা সে জানে না, তবু তাঁর কেমন করে মনে হতে লাগল ঐ বুদ্ধিমান ছেলেটি অনেক কিছুই জানে, যা তাঁর কাছে সে কখনও বলবে না।

বাইরে আগেকার সুরটা বজায় রেখে বললেন, 'অনুপমা, আজ আমাদের ওখানে তোমার যাবার কথা ছিল না?'

'হ্যাঁ, সেখানেই তো যাব। কিন্তু আপনি বেরিয়ে এলেন যে?'. আবার হাসল অনুপমা।

'চল তাহলে, আমি তো বাড়িতে ফিরব…'

পার্ক থেকে রাস্তায় পড়তে সত্যরঞ্জন বললে, 'আপনার লেটেস্ট রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ড শুনলাম,…ফাঁকি দিয়েছেন…'

সমাদ্দার বললেন, 'সে কি, সঙ্গীতরাজ্যেও ফাঁকি ধরে বেড়াচ্ছ তুমি!'

'নিশ্চয়ই, ফাঁকি দেব আর ধরা পড়ব না, তাহলে তো ভালোই হয়…' তারপর ফিরে অনুপমাকে বললে, 'গানটা আপনি স্রেফ দাদরাতে গেয়ে গেছেন…তালটা অবশ্য ছয় মাত্রার, কিন্তু তার চাল হচ্ছে দুই-চারের, তিন-তিনের নয়…'

'কেন, স্বরলিপি দেখে তো তৈরি করেছিলুম আমি…' মৃদুস্বরে বললে অনুপমা।

'দেখবেন আর একবার, আপনার রেকর্ড শোনার পর আমি আবার একবার দেখলাম কিনা…'

'অর্থাৎ কাউকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই, এমনকি আর্টিস্টকেও না…' অনুপমার দিকে ঈষৎ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন সমাদ্দার, পরিহাসে, উদার মর্যাদার ভঙ্গিতে ঠিক নিজের মতো হয়ে উঠতে চাইলেন তিনি কিন্তু ভেতরে ভেতরে আর একটা জায়গায় বোঝাপড়া চলছিল তাঁর। অনুপমা এসে দাঁড়াতে ভয় পেয়ে গেছলাম আমি? কেন… মনে মনে ভাবলেন তিনি। এটা কি? এটার মানে কি?

সত্যরঞ্জন চলে যেতে কতক্ষণ চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন সমাদ্দার। এক সময় বললেন, 'কোথায় বেরিয়েছিলে তুমি? জোর করে ধরে

আনলাম তো?…সে ঐ ছেলেটার জন্যে। থাক গে, তুমি ইচ্ছে করলে এখন যেতে পার।'

'না-না, আমি আপনার কাছেই আসছিলাম…' অনুপমার কণ্ঠস্বর আশ্চর্যরকম ভারি ভারি মনে হল। 'কাল আপনি আমাকে ভেতরের ঘরে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, কিন্তু চলে এসেছিলাম আমি, মিনিট পাঁচেক পরে…' বলতে বলতে পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে ও। স্পষ্টত, অশ্রু গোপন করতে চাইছিল।

'সে কি?'

'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু কি বলতে চেয়েছিলেন কাল?'

চূড়ান্ত অপমানে কাঠ হয়ে গেলেন সমাদ্দার। একেবারে রাস্তার ওপর, তাই, তা না হলে ওর হাতখানা মুচড়ে ধরতেন। ওই অতি-তুচ্ছ মেয়েটার স্পর্ধা হল কি করে, পেল তাঁকে লঙ্ঘন করার সাহস? কিন্তু একই সঙ্গে বুঝলেন, তাঁর সে জোর নেই। কোথায় পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গিয়েছে। ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন (তার অনেকটাই নিজের ওপর), 'দেন লেট মী অলসো কনফেস, আমিও বেরিয়ে এসেছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা না করে। আই ওআজ্ নট ইন এ মুড…'

'বেশ! কিন্তু আমি যদি থাকতাম, তাহলে? সারারাত বসে থাকতাম না কি?' ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল অনুপমা, ওর চোখে অপরূপ দৃষ্টি। মুগ্ধ হলেন সমাদ্দার কিন্তু গাটা জ্বালা করতেও লাগল। একটু আগেই না ওর কণ্ঠে অশ্রুর আবেগ শুনেছিলেন?

অনুপমা বললে, 'কিন্তু আপনার এই কনফেশানের দাম নেই, তার আগেই আমি জিতে গিয়েছি'…

'নিশ্চয়ই…তোমারই জয় হল। এখন ভেতরে এস, এসেই পড়েছ যখন…'

ঘরে ঢুকে দোতলায় সিঁড়িতে উঠতে উঠতে আদরে বাধো-বাধো গলায় অনুপমা বলতে লাগল, 'কাল আপনি করেছিলেন কি, মিঃ চোপরাকে দু ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছিলেন নিচে? আর দেখা করেন নি…' ওর হাসিতে, কণ্ঠস্বরের কাকুতে সমাদ্দারকে সমর্থন আর মজার ভঙ্গি দুই-ই ফুটে উঠল। 'সুশীলদা বলছিলেন আজ সকালে…আপনি বেশ করেছিলেন!'

সমাদ্দার একথার উত্তর দিলেন না। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালালেন তিনি।

বসতে বললেন অনুপমাকে। 'আপনার কফির কথা বলি?' উত্তরে ঘাড় নাড়লেন সমাদ্দার। অনুপমা বসতে যাচ্ছিল টুলের ওপর কালকের মতো, কিন্তু সমাদ্দার বললেন, 'না, বিছানায় বস, তুমি…'। অনুপমা পা ঝুলিয়ে বিছানায় বসতে না বসতে নিজেই টুলটা টেনে নিয়ে এলেন সমাদ্দার, একেবারে খুব কাছাকাছি ওর সামনে বসলেন। খাড়া হয়ে বসে কেমন একরকম স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে। একে পালঙ্কটা উঁচু আর টুলটা একেবারে ছোট, মনে হল কোনো ভাস্কর তাঁর গড়া দেবী-প্রতিমার দিকে প্রসন্ন, ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন।

সংকোচে ব্যস্ত হয়ে উঠল অনুপমা, তাড়াতাড়ি পা দুটো গুটিয়ে সরিয়ে নিতে চাইলে। কিন্তু সমাদ্দার ওকে বারণ করে তারপর বললেন, 'অনু, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, আমাকে বিয়ে করো তুমি…'।

ফিক করে হেসে ফেলল অনুপমা, কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে উঠল ও। 'এ আবার আপনার কি খেয়াল…'। কিন্তু সেই গাম্ভীর্যও পেরিয়ে গেল ও। নারীর অকৃত্রিম সম্ভ্রমবোধ আর লজ্জা ওর মুখে, ওর সমস্ত দেহভঙ্গিতে ফুটে উঠল, চোখ দুটি নামিয়ে নিলে ও।

'চার্মিং!'—মনে মনে বললেন সমাদ্দার কিন্তু সেইটেই কেমন রাগিয়ে দিতে চাইলে তাঁকে: 'ও কেন এত সুন্দর!' বাইরে বললেন, 'কেন বিয়ে করতে চাই? মনে কর তুমি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছ, সেই জন্যে তোমাকে বেঁধে রাখতে চাই নিজের আয়ত্তের মধ্যে…' বলতে বলতে একটা অনতিলক্ষ্য বিদ্রূপ ফুটে উঠল তাঁর কণ্ঠে।

'আমি খুব সামান্য মেয়ে, আমাকে এমন করে বলবেন না…'।

সমাদ্দার বিস্মিত হলেন, তাঁর ভয়ও হল যে কালকের মতো অনুপমা অভিমানভরে তাঁকে তিরস্কার করতে আরম্ভ করবে। তাড়াতাড়ি করে বললেন, 'না, অনু, আমি ঠাট্টা করছি না। আজকেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আমি একা, অত্যন্ত একা। আমাদের অর্গানিজেশনের মৃত্যু হয়েছে। যারা আমাদের উত্তরাধিকারী তাদের শরীরে বিষ ঢুকেছে, তোমার সুশীলদার মধ্যে, ঐ সত্যরঞ্জনের মধ্যে…হ্যাঁ, ওর মধ্যেও। ও মনে করছে ও সাধু, অন্যের সমালোচনা করছে তাকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্য। না, এটা ঈর্ষা, তুমি জান না, সেও জানে না। আমার খুব দুঃখ হয়, সারাজীবন খেটে এই পুরস্কার পেলাম…এই সুশীল আর এই সত্যরঞ্জনের মধ্যে? কিন্তু এ বিষ আমাদেরই

…আচ্ছা, বাপ যখন ছেলের মধ্যে নিজের দেহের বিষ সঞ্চারিত হয়েছে দেখে, তখন তার কি মনে হয়?'

'এ সব কথার কি বলব আমি? কিন্তু আপনাকে যখন কাতর হতে দেখি তখন আমার কেমন লাগে…'।

'কাতর!' আবার আহত হলেন সমাদ্দার। কিন্তু ওর ডান হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের মুঠোর মধ্যে পুরে বললেন, 'যাক সে সব কথা। কিন্তু আমার কথার উত্তর দিলে না তো?' একান্ত আগ্রহে তাকালেন তিনি অনুপমার মুখের দিকে, যেখানে ওর মসৃণ, ছোট্ট ললাটের ওপর আলো পড়েছে সেখানে ওঁর দৃষ্টি স্থির হল। একই সঙ্গে অনুভব করলেন, অনুপমার নরম হাতখানা তাঁর মুঠোর মধ্যে পালকের মতো কাঁপছে।

ও বললে, 'কোনো মেয়ে যখন সৌভাগ্যের দান পায়, তখন সে কি বলে? আমি কিন্তু এই সৌভাগ্যকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না…'।

হাসলেন সমাদ্দার। 'সৌভাগ্য তোমার নয়, সৌভাগ্য আমার। কিন্তু সেটা তুমি বুঝবে না। যাক, ওই কথাই রইল, এরপর তুমি সব ঠিক করে নিও। তোমার বাবাকে ব'লো…আর, হ্যাঁ, শোনো। সুশীলকে রেকমেণ্ড করে দিল্লী পাঠাচ্ছি আমি। কালকেই লিখে দেব। ও-ই যাক লীডার হয়ে…'।

যেন কথাটা বুঝতে পারছে না এমনি করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল অনুপমা, তারপর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়াল ও। দেখতে দেখতে স্ফুরিত হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ। বললে, 'এ কি বলছেন আপনি…সুশীলদার কথা আপনাকে বলেছিলাম আমি, সেই জন্যেই তাঁকে পাঠাচ্ছেন। অথচ আপনি সত্যিই তাঁকে পাঠাতে চান না! যেন আপনি আমার মুখের দিকে তাকিয়েই তাঁকে পাঠাচ্ছেন…'।

'মনে কর, তোমার মুখের কথাতেই তাকে পাঠাচ্ছি…' সমাদ্দারের চোখ মিটমিট করতে লাগল।

'না, এ হচ্ছে আপনার অহংকার আর ঈর্ষা। সুশীলদার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে আপনি কি ভেবেছেন…কাল আপনি কি বলেছিলেন মনে আছে? কাল কিছু বলি নি আপনাকে, কিন্তু এই একটু আগেই আপনি বিয়ের কথা বলছিলেন না? সেই মেয়েকে কি করে বিয়ে করতে চাচ্ছিলেন? ছিঃ…' রোষ-শুষ্ক অথচ উজ্জ্বল, পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ও।

সমাদ্দারের মিটিমিটি চোখের সঙ্গে ঠোঁট কাঁপতে লাগল। কোনো উত্তর না দিয়ে সরে গেলেন তিনি জানালার কাছে, যেখানে কাল দাঁড়িয়েছিলেন। শহরতলির ভাঙা-চোরা নৈশ রূপ ফুটে উঠল চোখের সামনে। কাছেই সেই নিমগাছটা অন্ধকার মাথায় জড়িয়ে রহস্যময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরে আবার ফিরে এসে অনুপমার সামনে দাঁড়ালেন তিনি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'অনু, একটা জিনিস সম্বন্ধে ভুল বুঝো না তুমি। সুশীলকে আমায় পাঠাতেই হবে, তার আর অন্যরকম হওয়া সম্ভব নয়। আমি যদি না-ও পাঠাই তাহলে সে আর কোনও ভাবে নিশ্চয়ই যাবে—তার চোখে সেই দৃষ্টি আমি দেখেছি। সেক্ষেত্রে তাকে পাঠানোর গৌরব থেকে আমি বঞ্চিত হই কেন?' বলতে বলতে কাতর হয়ে পড়লেন সমাদ্দার, স্পষ্টত, অত্যন্ত অরুচিকর ব্যাপারে তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে বলে। তারপর যেন জোর করে ব্যাপারটা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছেন এমনি করে বললেন, 'এতে আমার আজকের প্রস্তাবে রাজী না হতে পার, তাহলে…আচ্ছা, অনু, তুমি রাজী হতে পার না?' সমাদ্দার আরও একটু এলেন এগিয়ে, আলতো করে ওর দুই কাঁধের ওপর হাতের তেলো দুটি রাখলেন। হয়তো আরো কি করতেন, কিন্তু তার আগেই সমাদ্দারের দুই হাতের থেকে পিছলে যাবার মতো ওঁর পায়ের ওপর নেতিয়ে পড়ল অনুপমা। সমাদ্দার ওকে ওঠালেন না তখনই, কিন্তু একটি নারীদেহের থরথর ক্রন্দনাবেগ অনুভব করলেন ক্ষণকাল ধরে। ওরই মধ্যে তাঁর মনে হল, 'এটা ওরই জিত, আমার কিছু না…।' পরে বললেন, 'অনু, ওঠো…।'

অনুপমা পা ছেড়ে দিলে কিন্তু উঠে দাঁড়াল না। ওর বিস্রস্তবাস, একরাশ চুল খুলে গিয়ে সামনে-পেছনে ছড়িয়ে পড়েছে। ধরা গলায় ও বললে, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি যে কী বলে ফেলি…আপনি আমাকে…' আর বলতে পারল না ও।

সমাদ্দার হাত ধরে ওকে ওঠালেন, আবার বসালেন ওকে বিছানার ওপর। অনুপমা একটু শান্ত হয়ে এলে বললেন, 'অনু, তোমাকে অনুগ্রহ করে বিয়ে করতে চাই, মনে করো না। সে অধিকার যে আমার নেই তা তুমি জান। আমি তোমাকে কী করেছি…এ ব্রুট ওআজ্ দেয়ার ইন্ মী—' সহসা দ্রুতবেগে বলে উঠলেন তিনি: 'আমি বেশি দিন বাঁচব না আমি জানি, কিন্তু একটা সান্ত্বনা নিয়ে যেতে দাও আমাকে যে শেষ পর্যন্ত তোমার অসম্মান আমি করি নি!'

'না-না, ও কথা বলবেন না আপনি। আপনি কি আমাকে…আচ্ছা, ভালোবাসা কি সবার বড় নয় ?'

তৎক্ষণাৎ সমাদ্দার বলতে গেলেন, 'আঃ, সত্যিই যদি ওটা বিশ্বাস করতে পারতাম আমি।'—কিন্তু আস্তে আস্তে বললেন, 'বেশ, সেটাই সত্য হোক।'

চার

সমাদ্দার তার পরদিনই যথারীতি সুপারিশ করে সুশীলকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দিল্লীতে। কিন্তু যা কেউ আশংকা করে নি, ব্যাপারটা তাই হয়ে দাঁড়াল। দিন সাতেক পরে সুশীল দিল্লী থেকে ফিরে এল কেন্দ্রস্থ দলীয় অধিনায়কের জরুরী চিঠি নিয়ে। সেই চিঠিতে অধিনায়ক সুশীলের ইয়োরোপ যাত্রার সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি, কিন্তু বিনয় সমাদ্দারকেই তিনি দলের নেতা মনোনীত করেছেন। চিঠি লেখার তারিখ থেকে সপ্তম দিবসে দিল্লীতে সমাদ্দারকে উপস্থিত হতে হবে। তারপর তিনি রওনা হয়ে যাবেন।

সুতরাং সমাদ্দার এখানকার প্রয়োজনীয় টুকিটাকি ব্যাপার শেষ করে ইয়োরোপ যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। দোকান থেকে কিনে নিয়ে এলেন শীতের দেশে যাবার উপযোগী গরম পোশাক। যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় সত্যরঞ্জন আর অনুপমা এল দেখা করতে। সত্যরঞ্জন খুব খুশি। ওর যা স্বভাব, এই পরিবর্তনের ভেতরকার রহস্যের ওপর আলোকপাত করতে চাইলে ও। বললে যে, চোপরাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী ভেতরে কল-কাঠি নেড়েছে, এবং সেই জন্যেই এই পরিবর্তন।

সমাদ্দার বললেন, 'তাহলে দেখলে তো, কেবল সুশীলকেই যে তুমি দেখতে পার না তার হেতু নেই…।'

সত্যরঞ্জন জিব কাটল, 'ছি-ছি, আপনাকে আমি অবিশ্বাস করতে যাব! যে যতই কল-কাঠি নাড়ুক না কেন, আপনি সবার উর্ধ্বে। আপনি যদি কারুর স্বার্থ দেখেনও তবুও সেটা সাধারণ স্বার্থের বিরোধী হবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে…।'

'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, তাই যেন হয়…।'

সত্যরঞ্জন চলে গেলেও অনুপমা বসে রইল।

সমাদ্দার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কিছু বলবে না অনু? বিছানার যে

কোণটিতে অনুপমা বসেছিল, সেখানে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন সমাদ্দার। সত্যরঞ্জন নাই বুঝুক কিন্তু অনুপমার বুঝতে ভুল হয় নি কি অসহ্য অন্তর্দাহে পুড়ে মরছিলেন তিনি। ও আস্তে আস্তে বললে, 'আপনার যদি খারাপ না লাগে, তাহলে আপনাকে একটা গান শোনাব…!'

'গান শোনাবে! তোমার গান শুনতে আমার খুব ভালো লাগে ঠিকই। কিন্তু তুমি আমাকে বিদায়ের গান শোনাবে এটা আমি সহ্য করতে পারব না …নো ফেয়ারওয়েল সং, প্লীজ…।'

এই সব কথা বলছিলেন আর অন্য দিকে ওর হাত ধরে বিছানার থেকে ওঠাচ্ছিলেন। অনুপমা উঠে দাঁড়াতেই বুকের ওপর জড়িয়ে ধরলেন ওকে। অনুপমা বাধা দিল না ওঁকে। সমাদ্দার বললেন, 'অনু, আজ আমাকে একটা কথা বল, আমাকে তুমি…মানে, আমার সম্বন্ধে তোমার কোনো গ্লানি নেই…' কিন্তু ওর বলার জন্য অপেক্ষা করলেন না, ওর মসৃণ, উজ্জ্বল ললাটের ওপর পরিপূর্ণ চুম্বন দিলেন একটি। 'তুমি জান না, তোমার এই কপালটির মধ্যে কী মোহিনী আছে…কিন্তু না, তোমার কিছু বলার দরকার নেই। কেবল এটাই আমার থাক…' ওর মাথাটি ঈষৎ টেনে এনে কপালের ওপর যেখানে একটু আগে চুম্বন দিয়েছিলেন, তার ওপর নিজের গালটা রাখলেন একবার, তারপর ওকে ছেড়ে দিলেন।

'আজ আমি যাই…' কাঁপা-কাঁপা স্বরে বললে অনুপমা।

'না, আর একটু ব'সো। ভয় নেই, আর কাব্যিটাব্যি করব না। কফি খেয়ে যাও একটু…রতন, রতন,…' হাঁক দিলেন সমাদ্দার, পিছিয়ে এসে চেয়ারে বসতে বসতে।

অনুপমাও তাঁর বিপরীত দিকে বিছানায় বসল, নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল ও। বললে, 'আপনি বড় বেশি ভাবেন। এমনভাবে যাচ্ছেন যেন মনে হচ্ছে কতদিনের জন্য দেশছাড়া হয়ে চলেছেন…।'

'ঠিক, ফিরি কিনা সন্দেহ। সবার পথের কাঁটা দূর করে দিয়ে গেলাম…।'

চমকে অনুপমা ফিরে তাকাল। কিন্তু কেমন এক রকম করে ঘাড় বাঁকিয়ে বললে, 'আচ্ছা, আপনার যদি নিজের যাবার অনিচ্ছা, তাহলে না বলে দিন না কেন?'

'ডিসওবিডিয়েন্স? ছি…' তারপর আলিস ভাঙবার জন্য হাত দুটো মুড়ে চেয়ারের পেছনে নিয়ে গেলেন আর সেই অবস্থায় রাখলেন মাথার পেছনে।

তাঁর সুপুষ্ট বাহুদুটো অত্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বললেন, 'অনু, এসব তোমার বোঝার দরকার নেই। একটা গল্প বলি শোন। স্কটল্যাণ্ডের কর্দমাক্ত পথে এক বিদেশী পর্যটক বেড়াতে গিয়ে দেখেন, যতই এগোন, ততই কাদা বাড়ে। শেষে কাদা উঠল হাঁটু পর্যন্ত। এগোবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় সামনে কিছুদূরে এক ব্যক্তিকে দেখলেন আকণ্ঠ কর্দমে মগ্ন, কেবল মাথাটি জেগে আছে। সভয়ে হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে, ওখানে কাদাটা খুবই গভীর মনে হচ্ছে?' লোকটি উত্তর দিলে, 'যতটা তুমি ভাবছ তার থেকেও অনেক গভীর। আমি একটা বাসের ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে'।'

হেসে উঠতে গেল অনুপমা, কিন্তু এর কোনো অর্থ আছে ভেবে তৎক্ষণাৎ সেই আটকানো হাসির মুখে জিজ্ঞেস করলে, 'ওই গলা-ডোবানো লোকটা কে?'

'অন্তত তুমি নও...শোনো, একটু আগে সত্য খুব হাসি-খুশি করে গেল না? সুশীলের যাওয়া আটকেছে বলে ও খুব খুশি। কিন্তু ও জানে না পাঁক কত গভীর।'

'কিন্তু আপনি মনোনীত হয়েছেন এটা কী সত্যিই ভালো কথা নয়?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি যখন ইয়োরোপ থেকে ফিরব···ঠিক করে ফিরতে পারব তা আমি জানিনে, হয়তো ওখান থেকে আমেরিকায় পাঠানো হবে আমাকে···ফিরব প্রভিন্সিয়াল কমিটির নির্বাচনের আগেই। কিন্তু যখন ফিরব, তখন আর আমি প্রেসিডেন্ট থাকব না···মানে প্রেসিডেন্ট হতে পারব না···।'

'তার মানে?' অনুপমা রুদ্ধ বিস্ময়ে যেন ফিসফিস করে বললে।

'প্রেসিডেন্ট হবে ওই চোপরা গোষ্ঠীর লোক, তাকে চেন তুমি···আর তুমি কি হবে তাই ভাবছি···।'

'আমাকে যা খুশি বলুন আপনি। কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে আর হেঁয়ালির মধ্যে রাখবেন না···সব খুলে বলুন!'

অনুপমা বোধ হয় উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু সেই সময় ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল রতন, 'বাবু, আপনাদের কফি···।'

'আয়···' ঘাড়ের পেছন থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন সমাদ্দার।

গাগারিন ও মানুষের ভবিষ্যৎ

অমল দাশগুপ্ত

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর ও ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল—এই দুটি স্মরণীয় তারিখের মধ্যে পৃথিবীর সময়ের হিসেবে মাত্র সাড়ে-তিন বছর পার হয়েছে। চারশো কোটি বছরের পৃথিবীর কাছে এই সাড়ে-তিন বছর এতই অকিঞ্চিৎকর রকমের তুচ্ছ যে দুয়ের মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে এই সময়টুকুই মানুষের শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম কীর্তির সূচনাকাল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে প্রথম স্পুৎনিক আকাশে উঠেছিল। ঘটনাটা যে একেবারেই আচমকা ঘটেছিল তা নয়। রুশ বিজ্ঞানী জিওল-কোভ্স্কি ১৯০৩ সালেই একটি প্রবন্ধে নভোচারণার সম্ভাবনার কথা ব্যাখ্যা করেছিলেন। তারপরেও নানা দেশে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। উৎসাহী ব্যক্তিরা 'ইণ্টার-প্ল্যানেটারি সোসাইটি' গড়ে তুলে নভোচারণার সম্ভাবনা ও বাস্তবতা নিয়ে মাতামাতি করেছেন। যুদ্ধের সময়ে জার্মানরা তৈরি করেছিল ভি-২ রকেট। কিন্তু যুদ্ধের পরে ১৯৫৩ সালে এসেও দেখা যাচ্ছে, রকেটের উর্ধ্বগামিতার পাল্লা ৫০০ কিলোমিটারের বেশি নয়। কাজেই কেউ-ই ভাবতে পারেনি যে নভোচারণার স্বপ্ন এত তাড়াতাড়ি বাস্তব ঘটনার রূপ নিয়ে মহাকাশে পাক খেতে শুরু করবে। কিন্তু তারপরেও, সেই বাস্তব ঘটনাটি চোখের সামনে ঘটতে দেখেও, কেউ-ই ভাবতে পারেনি যে আর মাত্র সাড়ে-তিন বছরের মধ্যেই রক্তমাংসের সত্যিকারের একজন মানুষ রকেটবাহিত ব্যোমযানের যাত্রী হয়ে মহাকাশকে জয় করে ফিরে আসবে।

আর আজকের দিনেও, গাগারিনের আশ্চর্য সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হয়ে ওঠার পরেও, আমরা কেউ-ই ভাবতে পারছি না আগামী কয়েক বছরে আরো কী আশ্চর্য ঘটনা ঘটাবে।

বিজ্ঞানের কাছে মানুষের কল্পনা হার মেনেছে।

অবশ্য বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে গত একশো

বছরের মধ্যে কোনো সময়েই মানুষের কল্পনা বিজ্ঞানের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি। জুলে ভার্নে বা এডগার অ্যালান পো বা এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ কল্পনার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যত কিছু চমকপ্রদ ছবি এঁকেছিলেন তাও কয়েক বছরের মধ্যেই বিজ্ঞানের অগ্রগতির কাছে মামুলি ও ফিকে হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তবুও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষের জল্পনাকল্পনার শেষ নেই। বিশেষ করে নভোচারণার ক্ষেত্রে এসে মানুষের কল্পনা যেন সত্যিকারের মুক্তি পায়। বিপুল মহাবিশ্ব তার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। আর তখন কল্পনার রঙ দিয়ে মহাবিশ্বের বিচিত্র ছবি আঁকে সে।

আর তারপরে স্পুৎনিকের যুগ শুরু হবার পরে মানুষের কল্পনা একটা বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। এখন সে অনেকটা অঙ্কের মতো ছক কেটে কেটে ভাবতে পারে আগামী দশ বছর পরের ছবিটা কী হবে, বা আগামী কুড়ি বছর পরের, বা এমনকি একশো বছর পরের। কল্পনা করতে ও ছবি আঁকতে তো কোনো বাধা নেই—বিজ্ঞানের অগ্রগতি যতই সে-ছবিকে মামুলি ও ফিকে করে দিক না কেন!

কিন্তু ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে শুরু করার আগে গত সাড়ে-তিন বছরের কয়েকটি ঘটনাকে আরেকবার স্মরণ করে নেওয়া যাক। বিজ্ঞানের অগ্রগতি যে কি অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত তা এই ঘটনাগুলোকে একসঙ্গে চোখের সামনে মেলে ধরলে বুঝতে পারা যাবে।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে মাত্র ১৮৪ পাউণ্ড ওজনের একটি গোলককে আকাশে তোলা হয়েছিল। গোলকটি প্রতি ৯৫ মিনিটে একবার করে পাক খেয়েছিল এই পৃথিবীকে। এমনি ১৪০০ বার পাক খাবার পরে ১৯৫৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরে নেমে আসে ও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই হচ্ছে শুরু। সাড়ে-তিন বছর পরে এই শুরুর ঘটনাটি আমাদের কাছে আর তেমন মস্ত বলে মনে হচ্ছে না—কিন্তু তাই বলে এই ঘটনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। সোভিয়েত বিজ্ঞানী নেস্‌মিয়ানভ বলেছেন যে গুরুত্ব ও তাৎপর্যের দিক থেকে এই ঘটনার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে এমন ঘটনা মানুষের ইতিহাসে আর চারটি আছে—আগুনের আবিষ্কার, খনিজ পাথর গলিয়ে লোহা তৈরি করা, স্টিম-ইঞ্জিন চালানো ও পারমাণবিক তেজকে আয়ত্তে আনা। লক্ষ্য করবার

বিষয় এই যে প্রত্যেকটি ঘটনাই মানুষকে এক-একটি নতুন যুগে উত্তীর্ণ করেছে। স্পুৎনিকও এমনি এক নতুনতর যুগের সূচনা।

দু-নম্বর স্পুৎনিক আকাশে উঠেছিল ১৯৫৭ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখে। অর্থাৎ প্রথম স্পুৎনিকের মাত্র ত্রিশ দিন পরে। এই ত্রিশ দিনের মধ্যেই ১৮৪ পাউণ্ড মস্ত একটি লাফ দিয়ে হয়ে উঠেছিল ১১১৮ পাউণ্ড। পৃথিবীর একটি জীবন্ত প্রাণী যাত্রী হয়েছিল এই স্পুৎনিকের।

তিন-নম্বর স্পুৎনিক আকাশে ওঠে ১৯৫৮ সালের ১৫ই মে তারিখে। পুরো আট মাসও নয়। মাত্র আটমাস সময়ের ব্যবধানে তিন-তিনটি স্পুৎনিককে আকাশে তোলা যে কতখানি দক্ষতা ও প্রস্তুতি সাপেক্ষ তা অনুমান করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ওদিকে ১৯৫৮ সালের ২রা জানুয়ারি তারিখে এক-নম্বর লুনিকের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৫৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে দু-নম্বর লুনিকের ও ৪ঠা অক্টোবর তারিখে তিন-নম্বর লুনিকের। এই তিনটি লুনিক তিনটি তারিখ মাত্র নয়, তিনটি অভাবিতপূর্ব ও অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব। যাই হোক, আপাতত শুধু তারিখের দিকেই নজর দেওয়া যাক।

তারপরে ১৯৬০ সালে সাড়ে-চার টন ওজনের তিন-তিনটি ব্যোমযান। প্রথমটি ১৫ই মে তারিখে, দ্বিতীয়টি ১৯শে আগস্ট তারিখে, তৃতীয়টি ১লা ডিসেম্বর তারিখে। প্রথম ব্যোমযানের যাত্রী ছিল একজন নকল মানুষ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যোমযানের দুটি কুকুর ও কয়েকটি ইঁদুর ছানা। যাত্রী সমেত দ্বিতীয় ব্যোমযানকে মাটিতে নামিয়ে আনা হয়েছিল।

তারপরে ১৯৬১ সাল। প্রথমে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে আকাশে ওঠে সাড়ে-ছয় টন ওজনের চতুর্থ সোভিয়েট ব্যোমযান। তারপরে ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি ঘূর্ণ্যমান স্পুৎনিক থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে শুক্রগ্রহের উদ্দেশে রওনা হয়েছে একটি স্বয়ংক্রিয় আন্তঃগ্রহ স্টেশন। আর সবশেষের ঘটনাটি ঘটেছে ১২ই এপ্রিল তারিখে। মেজর য়ুরি গাগারিন নির্দিষ্ট একটি কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহের মতো পৃথিবীকে পুরো একটি পাক দিয়ে আবার পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।

গত সাড়ে-তিন বছরে এই হচ্ছে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ক্রিয়াকাণ্ডের একটা মোটামুটি ছক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্কিন বিজ্ঞানীদের

ক্রিয়াকাণ্ড। সব মিলিয়ে এই সাড়ে-তিন বছরের কালটুকু মানুষের ইতিহাসে এক আশ্চর্য তৎপরতার সাক্ষ্য।

গাগারিনকে তুলনা করা হয়েছে কলম্বাসের সঙ্গে। কলম্বাসের কৃতিত্ব মানুষকে এই পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে। গাগারিনের কৃতিত্ব মানুষকে এই মহাবিশ্বের সঙ্গে পরিচিত করাবে। গাগারিন সেই আশ্চর্য ভবিষ্যতের সূত্রপাত যখন পৃথিবীর মানুষ হয়ে উঠবে মহাবিশ্বের, খণ্ডকালের মানুষ মহাকালের।

এসব বিজ্ঞানীদেরই কথা। সহজ কথায় এর মানেটা কী দাঁড়ায়? পঞ্চভূতে গড়া এই নশ্বর মানুষ দেশ ও কালকে জয় করবে। অর্থাৎ, মানুষ আর এই পৃথিবীর সীমানায় বন্দী হয়ে থাকবে না। মানুষ আর এই কালের সীমানায় আবদ্ধ হয়ে থাকবে না। দুই-ই চমকে ওঠার মতো কথা। দেশ সম্পর্কে ও কাল সম্পর্কে আমাদের এতকালের সমস্ত ধারণাকে বাতিল করতে না পারলে এসব কথা বিশ্বাস করা শক্ত।

প্রথমে দেশ-জয়ের কথাটা ধরা যাক।

মানুষ নাকি এই পৃথিবীর বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এই মহাবিশ্বের যত্র-তত্র বিচরণ করে বেড়াবে। কথাগুলো কেন বলা হচ্ছে? না, মানুষ গোটাকতক কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করেছে আর গোটাকতক কৃত্রিম গ্রহ। অর্থাৎ, এতকাল সৌরমণ্ডল বলতে সংখ্যার দিক থেকে যে একটা ধরাবাঁধা হিসেব ছিল তা মানুষ তছনছ করে দিতে পেরেছে। এটুকু নিশ্চয়ই মানতে হবে। কিন্তু মহাবিশ্বে বিচরণ করার ব্যাপারটাও কি গ্রহ-উপগ্রহ তৈরি করার মতোই সহজ?

স্পুৎনিক ও লুনিকের মারফত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও মহাকাশ সম্পর্কে যে-সমস্ত খবর পাওয়া গিয়েছে তা মোটেও সুবিধের নয়। এতকাল আমাদের ধারণা ছিল যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল মাত্র কয়েক-শো কিলোমিটার উঁচু, তার বাইরে ফাঁকা মহাশূন্য। এই ধারণা ভুল। প্রথমত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কয়েক-শো কিলোমিটারের পরেই আচমকা শেষ হয়ে যায়নি। অনেক দূর পর্যন্ত তার রেশ থেকে গিয়েছে, এমন কি তিনহাজার কিলোমিটার উঁচুতেও। আর তারও ওপরে রয়েছে তড়িতাবিষ্ট কণিকার একটি মোড়ক, পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটারের চেয়েও বেশি উঁচু। তার মানে, বাইরে থেকে পৃথিবীটাকে দেখলে মনে হবে বস্তু একটি গ্যাসীয় গোলক। এই গোলকটির কেন্দ্রে রয়েছে

ছোট্ট একটি দানার মতো আটহাজার মাইল ব্যাসের এই নিরেট বস্তুপিণ্ড যাকে আমরা বলি পৃথিবী। তড়িতাবিষ্ট কণিকার দুটি পৃথক স্তর পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে, ভেতরের স্তরটি খুব সম্ভবত প্রোটন কণিকার এলাকা, বাইরের স্তরটি খুব সম্ভবত ইলেকট্রন কণিকার এলাকা। সব মিলিয়ে প্রচণ্ড তেজ ও বেগের একটি বলয়। য়ুরি গাগারিন এই বলয়ের অনেক নিচু দিয়ে পৃথিবীকে পাক খেয়েছেন। আর ভবিষ্যতের মহাকাশ-যাত্রীকে এই ভয়ংকর বলয়টিকে ফুঁড়ে বেরোতে হবে। রক্তমাংসের মানুষের শরীরের পক্ষে এজন্যে কি-পরিমাণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা দরকার তা এখনো হাতেনাতে পরখ হয়নি।

অবশ্য এই বলয়ের বাইরে মহাশূন্যের এলকাটিও নিতান্তই শূন্য নয়। সেখানে রয়েছে কস্‌মিক রে, ইন্‌ফ্রা-রেড রে, এক্‌স্‌-রে, নানান মাপের তরঙ্গ ও অজস্র তড়িতাবিষ্ট কণিকা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এই সমস্ত কিছু থেকে এবং আরো অনেক কিছু থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। মহাকাশের যাত্রী হওয়া মানেই এই পরম স্নেহের আশ্রয়টিকে ছেড়ে যাওয়া। তা বড় সহজ ব্যাপার নয়।

কিন্তু তারপরেও সমস্যা আছে। অন্য কোনো উপগ্রহে বা গ্রহে ডেরা বাঁধতে হলে সেই উপগ্রহ বা গ্রহটিকে মানুষের বাসের উপযুক্ত করে তোলা দরকার। আমাদের একেবারে হাতের কাছের উপগ্রহ চন্দ্র—পৃথিবী থেকে যার দূরত্ব মাত্র আড়াই লক্ষ মাইল—তাকেও মনুষ্য বসবাসের উপযুক্ত করে তোলাটা প্রায় একটা দুরূহ ব্যাপার। চাঁদের দেশে হাওয়াও নেই, জলও নেই। হাওয়ার আড়াল না থাকার ফলে মহাকাশের সমস্ত বিপজ্জনক রশ্মি সরাসরি এসে পৌছচ্ছে চাঁদের মাটিতে। নিঃশব্দে নেমে আসছে মস্ত মস্ত উল্কাপিণ্ড। জলও নেই। কাজেই চাঁদের এলাকাটি একেবারেই নিষ্পাদপ ও নির্জীবন। তার ওপরে চাঁদের দেশে দু-সপ্তাহ দিন ও দু-সপ্তাহ রাত্রি। দু-সপ্তাহের দিনে যেমন প্রচণ্ড গরম, দু-সপ্তাহের রাত্রিতে তেমনি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

অর্থাৎ বেড়াতে যাবার জায়গা হিসেবে চাঁদের দেশটি মোটেই মনোরম নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা খুঁটিয়ে পরিকল্পনা করেছেন কিভাবে এই দেশটিকেও তাঁরা মানুষের বাসযোগ্য করে তুলবেন। এই চাঁদের মাটিতেই তৈরি হবে একটি নকল পৃথিবী। তৈরি হবে পৃথিবীর মতো জল, হাওয়া আর ফুলে-ফলে ভরা গাছপালা। ঝল্‌সে উঠবে বিদ্যুতের আলো। পারমাণবিক তেজে

চালিত কারখানায় চাঁদের বিপুল খনিজভাণ্ডার কাজে লাগানো হবে। তৈরি হবে ব্যোমযানের জ্বালানি। ভবিষ্যতের গ্রহান্তরগামী মানুষ যাত্রা শুরু করবে এই চাঁদের দেশ থেকেই। ভবিষ্যতের জ্যোতির্বিদরা মহাকাশকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে এই চাঁদের দেশেই গড়ে তুলবেন মস্ত মস্ত মানমন্দির। হাওয়া ও মেঘ নেই বলে চাঁদের দেশ হচ্ছে মানমন্দিরের আদর্শ জায়গা। আর দু-সপ্তাহের রাত্রি পর্যবেক্ষণের পক্ষে প্রশস্ত সময়। তাছাড়া চাঁদের দেশটি হবে নভোচারণবিদদের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র। পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে বার-কয়েক যাতায়াত করার মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতের নভোচারণবিদ গ্রহান্তরে যাত্রার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

অবশ্যই কথাগুলো যত সহজে লেখা যাছে ব্যাপারটা তত সহজে ঘটবে না। তবে একথাও ঠিক যে মহাকাশ-যাত্রায় এখন আর টেক্‌নিকাল অসুবিধে কিছু নেই। গাগারিনের ব্যোমযানের বেগ যদি সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল না হয়ে সেকেণ্ডে সাত মাইল হত তাহলে অনায়াসেই এই ব্যোমযানটি চাঁদের দেশে পৌছতে পারত। বা চাঁদ ছাড়িয়ে অন্য কোনো গ্রহে। এবং এই বেগও যে অনায়ত্ত নয়, তিন-তিনটি লুনিক তার প্রমাণ।

চাঁদের পরেই মানুষের গন্তব্য-স্থান হবে শুক্র কিংবা মঙ্গল গ্রহ। গ্রহদের মধ্যে শুক্র হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের। প্রতি উনিশ মাস পরে-পরে এই গ্রহটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসে। গত ১১ই এপ্রিলটি ছিল এমনি একটি তারিখ। সেদিন পৃথিবী থেকে শুক্রের দূরত্ব ছিল দু-কোটি বাষট্টি লক্ষ মাইল। মঙ্গল কিন্তু কোনো সময়েই পৃথিবী থেকে তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ মাইলের চেয়ে কাছে আসে না।

অবশ্য মহাকাশ-যাত্রীর কাছে দূরত্বটা কিছুমাত্র সমস্যা নয়। কারণ মহাকাশে দূরত্ব অতিক্রম করতে হলে জ্বালানি খরচ করতে হয় না। ব্যোমযানের রকেটকে ততক্ষণই চালু রাখতে হয় যতক্ষণ না ব্যোমযানটি পৃথিবীর টান ছিঁড়ে বেরিয়ে আনার মতো বেগ সঞ্চয় করে। এবং এই প্রাথমিক বেগের সঞ্চয়টুকু প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটে যায়। তখন এই প্রাথমিক বেগের তাড়নাতেই ব্যোমযানটি এসে পৌছয় মহাকাশের নির্দিষ্ট একটি কক্ষে। তারপরে, যেমন এই পৃথিবী ও আরো আটটি গ্রহ সূর্যের টান ও নিজস্ব বেগের যোগসাজশে অনবরত কক্ষপথে ছুটে চলেছে—ব্যোমযানটিও সেই একই নিয়ম মেনে চলে। এই কারণেই একনম্বর লুনিক অনন্তকাল ধরে সূর্যের চারদিকে

পাক খেয়ে চলবে, যদি না সে অন্য কোনো গ্রহের টানের এলাকায় পড়ে যায়। ব্যোমযানের বেলায় এ-ব্যাপারটিকে ইচ্ছে করেই ঘটানো হয়। ব্যোমযানের কক্ষকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হয় যেন নির্দিষ্ট সময়ের পরে সেটি অন্য একটি নির্দিষ্ট গ্রহের টানের এলাকায় এসে পড়ে। এই যোগযোগটি না ঘটলে ব্যোমযান শুধু ছুটেই চলবে, অনন্তকাল ধরে ছুটবে—যেমন ছুটছে এই পৃথিবী ও অন্য আটটি গ্রহ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মহাকাশ-যাত্রার জন্যে টেক্‌নিকাল প্রস্তুতি ছাড়াও দরকার সময়ের একটা পরিধি।

সময়ের কথাটা এজন্যে উঠছে যে গ্রহান্তরে যাওয়াটা চাঁদে যাওয়ার মতো অল্প সময়ের ব্যাপার নয়। প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন বেগ নিয়ে রওনা হলে শুক্রগ্রহে পৌছতে সময় লাগবে ১৪৬ দিন, মঙ্গলগ্রহে পৌছতে ২৫৯ দিন, বৃহস্পতি গ্রহে ২ বছর ২৬৭ দিন, শনিগ্রহে ৬ বছর ১৮ দিন, ইউরেনাস গ্রহে ১৬ বছর ১৪ দিন, নেপচুন গ্রহে ৩০ বছর ২২৫ দিন, প্লুটো গ্রহে ৪৫ বছর ১৪৯ দিন। এই হিসেব থেকে সহজেই বোঝা যে পৃথিবীর একজন মানুষের পক্ষে প্লুটো গ্রহে পৌছনোটা যদিও বা সম্ভব কিন্তু ফিরে আসাটা নয়। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে তার জীবনের আয়ু এতখানি সময়ের পরিধিকে বরদাস্ত করতে পারবে না। সৌরমণ্ডলের চৌহদ্দিতেই এই ব্যাপার। এক্ষেত্রে সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে যাত্রা করাটা নিতান্তই অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। লুনিক যদি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের তারার উদ্দেশে যাত্রা করত তবে একবার যাতায়াতে লুনিকের সময় লাগত ৭০,০০০ বছর। গড়ে একশো বছর পরমায়ু ধরলেও একজন মানুষকে এই যাত্রাটি সাঙ্গ করতে হলে অন্তত সাতশো বার নতুন করে জন্মাতে হবে।

কিন্তু আগেই বলেছি, ভবিষ্যতের মানুষ হবে কালজয়ী। কি ভাবে?

আমরা যতক্ষণ এই পৃথিবীর মানুষ ততক্ষণ আমাদের কাছে সময়ের একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর পুরো একটি পাক খাওয়ার সময়কে আমরা বলি বছর। এই বছর-পরিমাণ সময়কে আমরা আবার দিন-ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ডে ভাগ করে নিয়েছি। পৃথিবীর মানুষ হিসেবে আমাদের একজন মানুষ যদি হয় 'ক', আরেকজন মানুষ যদি হয় 'খ'—তাহলে ক-এর এক ঘণ্টা সবসময়েই খ-এর এক ঘণ্টার সমান।

এই উক্তি এই বিশেষ অবস্থায় সত্যি। কিন্তু ভবিষ্যতে এমন দিন আসছে

যখন ক ও খ একই পৃথিবীর বাসিন্দা নাও হতে পারে। তখন? সেই নির্বিশেষ অবস্থায় সময়ের মাপ কী হবে?

আসলে সময়ের মাপটা নির্ভর করে বস্তুর বেগের ওপরে। একই পৃথিবীর বাসিন্দা হিসাবে মহাশূন্যে ক-এর বেগ যা, খ-এর বেগও তাই। অতএব দুজনের সময়ও সমান। কিন্তু এমন ব্যাপার যদি ঘটে যে ক প্রচণ্ড বেগে পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুট দিয়েছে—সেক্ষেত্রে ক-এর বেগ খ-এর বেগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। এবারে কিন্তু দুজনের সময় এক হবে না। ক-এর কাছে যে-পরিমাণ সময়কে মনে হবে হয়তো এক ঘণ্টা খ-এর কাছে তাই মনে হবে অনেক অনেক বেশি। মনে করা যাক ক এমন একটি রকেটের যাত্রী হয়ে মহাশূন্যে ছুট দিয়েছে যে-রকেটের বেগ আলোর বেগের প্রায় কাছাকাছি। সেক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে ক-এর কাছে যা এক বছর খ-এর কাছে তা এককোটি বছর।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন যে ভবিষ্যতের মানুষ ফোটোন রকেটের যাত্রী হয়ে মহাবিশ্ব পরিক্রমা করবে। এই ফোটোন রকেটের বেগ আলোর বেগের প্রায় কাছাকাছি। কাজেই এখন থেকেই অনুমান করা চলে যে পৃথিবীর মানুষের এতকালের ধরাবাঁধা সময়ের হিসেবটি সেদিন একেবারেই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে যে সাতাশ বছরের গাগারিন একশো-আট মিনিটের মহাকাশ-পরিক্রমা শেষ করে পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখবে পৃথিবীটা ইতিমধ্যে একশো-আট বছরের পুরনো হয়ে গিয়েছে।

তবে এই অবস্থাটি মানুষের পক্ষে কাম্য হবে কিনা সে-প্রশ্ন নিশ্চয়ই তোলা চলে। রবীন্দ্রনাথ যদি সত্যি সত্যিই কালিদাসের কালে ফিরে যেতে পারতেন তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই কালিদাসের কালটি তাঁর কাছে অসহ্য বলে মনে হত। কিংবা তিনি যদি সশরীরে হাজির হতে পারতেন একশো বছর পরের কালে তাহলে তাঁর খুশি হবার শুধু এটুকুই কারণ থাকত যে তিনি দেখতেন তাঁর কবিতা তখনো পড়া হচ্ছে। কিন্তু অন্য কোনো ব্যাপারেই সেই একশো বছর পরের পৃথিবীর সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারতেন না।

যাই হোক, এসব সমস্যা আমাদের নয়। আমরা অন্তত এই ভেবে খুশি হতে পারি যে আমাদেরই এই পৃথিবীর ও আমাদেরই এই কালের একজন মানুষের কৃতিত্বের মধ্যে দিয়ে সেই আশ্চর্য ভবিষ্যতের সূত্রপাত হল যখন মানুষ হয়ে উঠবে শুধু এই পৃথিবীরই নয়—মহাবিশ্বের; শুধু এক খণ্ডকালেরই নয়—মহাকালের।

লোকসাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ

তুষার চট্টোপাধ্যায়

"আমি তার অভিনন্দন করি, সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার করে না, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানবচিত্তের যে তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধরে আপন সত্য রক্ষা করে এসেচে তারই পরিচয় লাভ করব এই আশা করে।" (প্রবাসী ১৩৩৪)

প্রথম বাউল সঙ্গীত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সংগ্রহ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করে রবীন্দ্রনাথের যে মন্তব্য তা কেবল বিষয়ের সমন্ধে নয়, লোকসাহিত্যের সামগ্রিক তাৎপর্যের অনুধাবনে উৎসুক বলে আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হবার অবকাশ পায় তখন, যখন—"চিরদিনই লোকসাহিত্য লোকে আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে" (কালান্তর, লোকহিত) এইরূপ স্পষ্ট ঘোষণা করে তিনি লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনার দায়িত্ব আপন হাতে গ্রহণ করেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাতেই লোকসাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয় এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

ছড়া রূপকথার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ আজন্ম। বালক বয়সে কাঁধে চাদর হাতে থেলো হুঁকো কিশোরী চাটুজ্যে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে যখন পাঁচালী ছড়া বলতেন তখন রবীন্দ্রনাথ ক্লাসে ওঠার দায় দূরে ফেলে স্বপ্নালোকে বিচরণ করতেন—

"দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লব-কুশের ছড়া
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া।" (ছেলেবেলা)

"শিশু কবি শিশুশিক্ষার প্রথম পাঠ লইয়া ছিলেন এই ছড়ার ছন্দ হইতে, গুরু মহাশয়ের নিকট ঘণ্টা ধরিয়া বই লইয়া এ শিক্ষা পাওয়া যায় নাই, এই ছন্দের শিক্ষা কবিজীবনে কি ভাবে সার্থক হইয়াছিল, তাহার হিসাব দেওয়া জীবনীকারের সাধ্যের অতীত।"
(রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়)

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পাঠ-গ্রহণ ছড়া থেকে, আর ছেলেবেলা থেকেই রূপকথা ও লোকসাহিত্যের ভারহীনতা, অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্যের ধারা তাঁর চিত্তকে ইচ্ছাময় আনন্দের সান্নিধ্যে প্রভাবিত করেছে। তাই স্কুল পালানো বালকের মন পাঠ্যপুস্তকের বাইরে লোকসাহিত্যের স্বপ্ন জগতে যে সহজ মুক্তি খুঁজে পেয়েছিল, সম্ভবত তারই প্রেরণায় তাঁর পরিণত বয়সের লোকসাহিত্য সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য দেশে যে ব্যাপক লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও গবেষণার প্রসার তারই প্রভাবে মূলত এদেশে লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও তদ্‌বিষয়ক আলোচনার প্রচেষ্টা। লালবিহারী দে, গিয়ারসন, দীনেশ সেন প্রভৃতি যাঁরা এদিকে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই অধিক কৃতিত্বের অধিকারী। সদ্য প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর মুখপত্রে রবীন্দ্রনাথ ১৩০১ ও ১৩০২ সালে যথাক্রমে 'ছেলে ভুলানো ছড়া' ও 'ছড়া সংগ্রহ' প্রকাশ করেন। এ দুটি আলোচনাই প্রকৃতপক্ষে লোকসাহিত্য সংগ্রহে আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং এদেশে লোকসাহিত্য বিষয়ক সকল আলোচনার উৎসমুখ খুলে দেয়। তারই প্রেরণায় মূলত সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সংকলিত আঞ্চলিক গান ও ছড়ার ধারাবাহিক প্রকাশ ও নানারূপ আলোচনার সূত্রপাত।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া' গ্রন্থের ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছড়া সংগ্রহের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন—

> "কথাটা একটু খুলিয়া না বলিলে ছড়া সংগ্রহের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কিছুদিন হইতে অনন্য সাধারণ প্রতিভায় অলঙ্কৃত পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঠিক এই জাতীয় কবিতা সংগ্রহের অভাব খুব তীব্র ভাবে করিয়া আসিতেছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি প্রকাশ্য সভায় 'মেয়েলি ছড়া' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।"…

> "রবীন্দ্রবাবু প্রবন্ধপাঠেই নিরস্ত ছিলেন না; তিনি স্বয়ং সংগ্রহ-কার্যেও নিযুক্ত ছিলেন।"

প্রকৃতপক্ষে লোকসাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ছড়া-সংগ্রহে নিমগ্ন ছিলেন। এবং নিজে সংগ্রহে প্রবৃত্ত হবার পূর্বেও অন্যের

দ্বারা লোকসাহিত্য বিশেষ করে রূপকথা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন—

> "ইতিপূর্বে কোনো কোনো গল্পকুশলা অথচ শিক্ষিতা মেয়েকে দিয়া আমি রূপকথা লিখাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি।"
>
> (বোলপুর, ২০শে ভাদ্র ১৩১৪)

> "বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।"

মোটের ওপর সংগ্রাহকরূপেই যে তাঁর লোকসাহিত্যের প্রাঙ্গণে অনুপ্রবেশ এ-কথা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই সংগ্রহ ব্যাপারে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য লোকসাহিত্য বিশারদদের পদ্ধতি থেকে যে তাঁর পার্থক্য অনেক এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য।

নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, সামাজিক ঐতিহাসিকতত্ত্ব ইত্যাদির প্রেক্ষিতে আধুনিক গবেষকের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য সংগ্রহ করেন নি; নিজস্ব রস, রুচি ও সৌন্দর্যচেতনা অনুসারেই তিনি এগুলি সংগ্রহ করেছেন। নিজস্ব নীতিবোধের দ্বারা তিনি কোনো কোনো স্থানে ছড়াকে পরিবর্তনও করেছেন। লোকসাহিত্য সংগ্রাহকের পক্ষে এ জাতীয় পরিবর্তনসাধন কতদূর সঙ্গত সে সম্পর্কে স্বভাবতই জিজ্ঞাসার অবকাশ থাকে, তথাপি এ কথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথই সংগ্রহ ও আলোচনার মাধ্যমে সাধারণের দৃষ্টি এদিকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেমন, লোকসাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ স্বরূপভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অপেক্ষা স্বাভাবিক কাব্যরসাস্বাদনেই অধিক আকৃষ্ট।

> "It attracted him for its extraordinary beauty of expression." (Dusan Zbavitel)

> "আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিক আদরনীয় বোধ হইয়াছিল।" (ছেলেভুলানো ছড়া)

তাই আধুনিক লোকসাহিত্য-বিশেষজ্ঞ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য বিচারের পদ্ধতি অনেক পৃথক। তাঁর লোকসাহিত্য আলোচনার পদ্ধতিকে

চেকোস্লোভাকিয়ার প্রখ্যাত অধ্যাপক Dusan Zbavitel-এর ভাষায় বলা যায়—

"His manner of treatment, though not based on what we would call the scientific method, was that of a critic of literature or a literary historian."

(Rabindranath and the Folkliterature of Bengal.)

প্রধানত সাহিত্যিক রসমাধুর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হলেও এবং লোক-সাহিত্যের মধ্যে সত্যানুসন্ধানে অনীহা থাকলেও ("এই সকল ছড়ার মধ্য হইতে সত্য অন্বেষণ করিতে গেলে বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হইবে"), রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের মধ্যস্থ সামাজিক উপাদান ও সমাজবাস্তবতা উপেক্ষা করেন নি। বিপরীতক্রমে এগুলির মধ্যে পল্লীবাংলার চিত্র, সামাজিক বিধিবিধান, পণপ্রথা, শ্বশুরবাড়ির যন্ত্রণা প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চিত্র অবলোকন করেছেন।

"ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসি-কান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।" (ছেলেভুলানো ছড়া)

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ছড়ার মধ্যে "Scraps of Reality", পুরানো ঘটনা, প্রাচীন মানুষের আনন্দ-বিষাদের ছবি প্রত্যক্ষ করেছেন। Gomme যেমন লোকসাহিত্যের মধ্যে সামাজিক উপাদানের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেন—

"Folklore in its earliest stages has brought down from the most ancient times memories of ancient polity, faith, custom, rite and thought."

রবীন্দ্রনাথও তেমন ভাষান্তরে বলেন—

"অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।" (ছেলেভুলানো ছড়া)

এবং 'কবিসংগীতে' তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন—

"কবিদলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজ-ইতিহাসের একটি অঙ্গ।" (কবিসংগীত)

লোকসাহিত্য যে লোকায়ত জীবনাশ্রয়ী এবং তা কৃষিভিত্তিক সংহত গ্রামবাংলার মর্মকে উদ্ঘাটন করেছে এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ়—

"প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়।"

(ছেলেভুলানো ছড়া)

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলি অনুধাবনে মনে হয়—রবীন্দ্রনাথের কাছে বোধহয় এ সত্য অজ্ঞাত ছিল না যে—

"Folklore, is an historical science, where the soul of the people speaks out. It is the detail of every day thought and ceremony, custom and action, faith and tradition of common people."

(Gomme—Folklore as an Historical Science)

তাই ছড়ার চিত্রধর্মিতার কথা বলতে যেয়ে প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছেন—

"একটা তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখে সমস্ত বঙ্গগৃহ বঙ্গসমাজ জীবন্ত হইয়া উঠিয়া আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে।" (ছেলেভুলানো ছড়া)

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য তথা গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যে "বাংলা দেশের গ্রাম্য কুটিরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত" দেখেছেন। (গ্রাম্য সাহিত্য) সমগ্র দেশের জীবনচক্রে লোকসাহিত্যের মূল নিহিত। কর্মব্যস্ত সংসারের জীবনস্পন্দন এবং আকাশের কোমল প্রশান্তি সবই লোকসাহিত্যে রূপায়িত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই সাহিত্য—

"রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে।" ('ঠাকুরমার ঝুলি' : ভূমিকা)

উৎস ও ব্যবহারিকতায় লোকসাহিত্যের এই সর্বজনীনতা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে। তিনি লোকসাহিত্যে ব্যক্তিহৃদয়ের পরিবর্তে সমষ্টিগত সামাজিক হৃদয়কেই বাঙ্ময় হয়ে উঠতে দেখেছেন। তাই লোকসাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

"কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে, পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে" (গ্রাম্যসাহিত্য)

এককথায় রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যে সহজের ভূমিকায় সমাজমানস ও লোকায়ত জীবনের সুখ-দুঃখময় যাত্রাপথের একতান শ্রবণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য বিষয়ক সমস্ত আলোচনাই যে সামগ্রিক বিচারে বিজ্ঞানসম্মত, অভ্রান্ত বা সম্পূর্ণ একথা চূড়ান্তভাবে বলা না গেলেও এ সত্য অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যে যে লোকমানসের প্রতিফলন দেখেছেন এবং তার মধ্য থেকে যে জনসাধারণের হৃদয়ে স্পন্দন অনুভব করেছেন, তা তাঁর মানবতাবাদী সত্যনিষ্ঠ মুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিরই পরিচায়ক।

গবেষকের তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টিতে নয়, গভীর রসানুভূতি ও ব্যাপক সহানুভূতির প্রেরণাতেই লোকসাহিত্যের 'পোড়োজমিতে' রবীন্দ্রনাথের পদক্ষেপ। এই প্রসঙ্গে ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্ধৃত করা যায়—

> "রবীন্দ্রনাথ···কেবলমাত্র নিজের কবিহৃদয়টি খুলিয়া দিয়া ইহাদিগকে তাহার মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্র-কবিমানসের শৈশবস্মৃতির পটভূমিকা হইতে ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পরিণত রসপাত্রে পরিবেশন করিয়াছেন।"

মোটের উপর লোকসাহিত্য পঠন-পাঠন ও অনুশীলন পর্যালোচনার যে ব্যাপক সম্ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় হৃদয় দিয়ে উদ্ঘাটন করেছেন, দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে তাকে সম্প্রসারিত করার দায়িত্ব উত্তর-সাধকের।

সাম্প্রতিক সাহিত্য

জর্মানির গল্প

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

"১৯১৫ থেকে ১৯৩৩ সালের জর্মানি-তে এই গল্পগুলির জন্ম।"

আর্নল্ড ৎসোয়াইগ্-এর এই দুই ছত্র ভণিতা অর্থহীন নয়। ১৯১৫ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের তাণ্ডবতা বহমান। ১৯৩৩ সালে নাৎসী শক্তির ক্ষমতা প্রাপ্তি। আর, এই দুই প্রান্তসীমায় বেষ্টিত কালের ইতিহাসে দারুণ অর্থনৈতিক দুর্যোগ। এই ইতিহাসের ভিত্তিতেই ৎসোয়াইগ্-এর গল্পের প্রতিষ্ঠা। তবু দুস্তর জীবনের নিঃশ্বাসবায়ু তার প্রাণস্বরূপ। লক্ষ্য করেছি, সাবেকী রীতির ছোটগল্প থেকে এর জাত আলাদা। ছিন্ন ভগ্ন বিচ্ছিন্ন জীবন, মুহূর্তবিশেষের ভাব অনুভূতি অভিজ্ঞতা, নিমেষমাত্রের দর্শন কিংবা মানবমনের কাটা-ছেঁড়া টুকরো—অসম্পূর্ণের এই জগৎই ছোটগল্পের লীলাভূমি। অথচ, ৎসোয়াইগ্-এর গল্পে বারবার এই অসম্পূর্ণ সম্পূর্ণতরকে স্পর্শ করেছে। তাই কার্ল্ ফিগুল্-এর রুবেৎসাল্-স্বপ্নও অর্থগভীর—কাহিনীকার সেই স্বপ্নের উৎসের সন্ধান রাখেন। তার শয্যা, তার খাটের আকার, তার বিছানার চাদর, সেই ঘরটার মধ্যেই, এই সকল-কিছুর মধ্যেই এমন একটা শক্তি আছে—যে শক্তি কার্ল্-কে আদি শৈশব থেকেই ঊর্ধ্বদৃষ্টি করে রেখেছে, তার চোখ ঘরের কড়িকাঠেই ঠেকে থেকেছে। দেয়ালের ফাটা খাঁজের রেখা তার মনে মানচিত্রের আভাস এনে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই রূপকথা-লোক পরিক্রমার আকৃতি রচনা করেছে। শুধু ঐটুই নয়। ঐ স্বপ্নরচনায় কার্লের ফ্যাকাশে মুখ, এগিয়ে-আসা ভুরু, চওড়া কপাল, এদেরও যেন ভূমিকা আছে। তরুণী বিধবা ক্লারা ফিগুল্-এর সারাদিনের চাকরি, আর সেইহেতু অষ্টমবর্ষীয়

*A Bit of Blood and Other Stories by Arnold Zweig, Seven Seas, Berlin. (Distributors : National Book Agency, Calcutta-12). Rs. 2/-.

কার্ল-এর নিঃসঙ্গ দিবাযাপন ও স্নানাহার-সাজসজ্জায় লাগাম-ছাড়া বিশৃঙ্খলাও ঐ স্বপ্নের পটভূমি। দৈনন্দিনের ইতিহাসে যে-স্বপ্নের জন্ম, সে-স্বপ্ন স্বভাবতই জীবনের অঙ্গ, জীবনের চেয়েও হয়তো সত্য। তাই ট্রামের ঘর্ঘর কার্লের কানে পৌছয় না, শহরের পীচের রাস্তায় ট্রামগাড়ি আর সমুদ্রচারী জাহাজ একাকার হয়ে যায়। নিছক স্বপ্নও নবতর অর্থ পায়। ঠিক এইভাবেই মান্-এর গল্পে টোনিও ক্রোজার-এর ভালোবাসার ভিত্তিভূমি তার অঙ্গের ভূষণ ছাই-রঙের বেল্ট-বাঁধা ওভারকোট, তার হাঁটার চাল, তার হাতের ছড়ের টানে বেজে-ওঠা বেহালার সুর, তার বাগানে বুড়ো ওয়াল্নাট্ গাছের ডালের ছায়ায় ফোয়ারার জলের টালমাটাল নাচ, উত্তর সাগরের গ্রীষ্মকাল, তার মায়ের হাতের স্পর্শে পিয়ানোর গান—এই সব-কিছুই। টুকরো নিয়েই যেখানে কারবার, সেখানে বারবার টুকরোটাকে ঘিরে আস্ত জিনিসটার ছায়া রচনা করা, অংশ-মাত্রকে সমগ্রের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলিয়ে দেওয়া—এই রীতিটা যেন ছোট-গল্পের উপর উপন্যাসের ছায়া। এতে ছোটগল্পের জাত মারা যায় না, কিন্তু শ্রেণীভেদনির্দেশের প্রশ্ন এসে পড়ে।

স্বপ্ন যখন জীবনের চেয়েও সত্য হয়ে ওঠে, তখন তা প্রাপ্তির সম্ভাবনায়, অন্তত প্রতিশ্রুতিতে, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ৎসোয়াইগ-এর 'সাইলেশীয় কাহিনী'-র অর্থ সেইখানেই। জীবন যখন দুর্বিষহ, তখনও সেই জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে কোনো এক স্বপ্ন, কোনো এক আশীর্বাদের ইন্‌তিজারে আশ্রয় নিতে হয়। "জীবন চমৎকার: রাস্তায়, ওডার-এর তীরে, মাঠে-প্রান্তরে, যেখানে-সেখানে যা-ই ঘটুক না কেন, সবই আশ্চর্য—আরো আশ্চর্য, কোনো দাম লাগে না বলে।" নর্দমার জলে কাগজের নৌকো ভাসাতে বেশি কিছু লাগে না—খাতার ছেঁড়া পাতাই যথেষ্ট। "কিন্তু, মানুষজন, ঘরবাড়িকে ঘিরে যা-কিছু, সবই বিশ্রী—বন্ধ দ্বার, বাঁধনে ক্লিষ্ট, দরজার জং-ধরা পাল্লার মতো ক্যাঁচকেঁচে।" দারিদ্র্যের আঘাতে জর্জর রশিগুলোতে টান পড়ছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে—সমাজের বন্ধন, সমাজে আস্থা শিথিল হয়ে পড়ছে। "মানুষ নিজেকেই সামলাতে পারছে না, তাই পরকেও সাহায্য করতে পারে না।" এরই মধ্যে স্বপ্নের জন্ম হয়। কার্ল খুঁজে বের করবে রুবেৎজাল-কে—সেই বরদাতা অতিপ্রাকৃত অশরীরীকে। দারিদ্র্যের পৃথিবী থেকে পালাতে হবে রূপকথার পৃথিবীতে। সমাজ যখন তার অর্থ হারিয়েছে তখন সে-সমাজ বাসের অযোগ্য। তার চেয়ে ঢের ভালো, নিরুদ্দেশ যাত্রা। অবশ্য, কার্ল জানে,

তার পথের শেষ কোথায়—শ্রীডেবের্গ পাহাড়ের কাছে রীজেন্‌গেবির্গে-তেই রুবেৎজাল-এর বাস। রীজেন্‌গেবির্গে-র পথেই কার্ল যাদের জীবনের প্রান্তে জড়িয়ে পড়েছিল, সেই আন্টোলিয়া আর কোন্ তারই মধ্যে ভাবীকালকে দেখেছিল, নিজেরা পরস্পরের আরো কাছে সরে এসে এক হতে পেরেছিল। রুবেৎজাল্-কে রীজেন্‌গেবির্গে-তে খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিন্তু তার আশীর্বাদ ফিগেল্ পরিবারের উপর এসে পড়েছিল। ফিগেল্-জননী দেখে-ছিলেন, "অন্য জগৎ থেকে ছিট্‌কে-আসা দুটো মানুষ", তাদের মধ্যে দেখে-ছিলেন কোনো এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি—রূপকথার অন্তে রাজপুত্র-রাজকন্যার সেই অতিমধুর যুগলজীবনের ফ্রেমে-বাঁধা ছবি। আর, কার্ল জেনেছিল, পৃথিবীতে এমন মানুষ আছে যারা রাস্তার ধারের বাচ্চা ছেলেটাকে রুবেৎজাল্-এর আস্তানায় নিয়ে যায়, আদর করে, বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে যায়, আবার চলে যাবার আগে দেখা করতে আসে। "উত্তরকালেও কার্ল ফিগেল-এর স্পষ্ট মনে ছিল সেই মুহূর্তটা যখন সেই তরুণী গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিল—কার্ল-এর ভবিষ্যতের পথে সেই যাত্রা শুরু।" স্বপ্নও এইভাবে সময়ে-সময়ে জীবনে অর্থ আনে।

কার্ল ফিগেল স্বপ্নে মুক্তি পেয়েছিল। অটো টেমকে ব্যর্থতা-বঞ্চনার চোরাবালিতে পৌছেও অন্তত একটিবারের জন্য তার সমস্ত শক্তি সংহত করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বোতল বোতল ব্র্যাণ্ডির ফল ফলেছিল—অটো টেমকে হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। সেদিন তার ট্রেন সে কোনো স্টেশনে থামায় নি—সব বিধিনিষেধ নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করে তার ট্রেন বিদ্যুৎগতিতে রাইখস্কানৎস্লার স্কোয়ারে পৌছে গিয়েছিল। "যাত্রীরা মানুষ, তদুপরি বার্লিনার"; তারা ক্ষমা করেছিল। ডাক্তার সাহেব বিশ্রাম-আবাসে পাঠাবার ফরমায়েস করেছিলন। ঐ "সাময়িক নিয়মবিচ্যুতি"টুকুই অটো-কে বাঁচিয়েছিল—দুঃসহ গ্লানিভারের অমোঘ পরিণতি আত্মহত্যা থেকে। অটো আত্মহারা হয় নি—বরং ঐ এক দুর্ঘটনার মধ্যেই সে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল, জীবনকে ফিরে পেয়েছিল। নিজের বিপুল শক্তির চেতনায় সে উপলব্ধি করেছিল যে, তাকে বাঁচতেই হবে। সে বেঁচেওছিল।

"লাঠি-হাতে বুড়ো" গল্পে হের ক্রয়টেল-এর কাছে "নাগরিক সহায় সমিতি"র চিঠি এসেছে। বৃদ্ধ অশক্ত য়িহুদীদের সেবায় নিয়োজিত সমিতি

ক্রয়টেল-এর কাছে অর্থসাহায্য চেয়েছে। "সিগফ্রিড ক্রয়টেল—গুহার অন্ধকারে বৃদ্ধ পশু, অতীতের দিনগুলোয় বেঁচে মৃত্যুর দিন গুনছে।" অতীতাশ্রয়ী জীবনের ক্ষতবিক্ষত পঙ্গু নায়ক তার সমৃদ্ধ যৌবনকালকে ভোলে না—দুঃস্থ অসহায়ের সাহায্যের প্রার্থনায় সাগ্রহে সাড়া দিতে গিয়ে তার হঠাৎ মনে পড়ে, সে নিজে আজ কোন্ দলে? সিগফ্রিড ক্রয়টেল-এর দিনকাল বদলে গেছে। "নাগরিক সহায় সমিতি"র কাছে শেষে ক্রয়টেল-ই সাহায্যের প্রার্থনা জানায়। এ-ভিক্ষা পরাজয় নয়—একটা বিরাট নালিশ। অন্নদাতাও আজ অন্নের কাঙাল। তবু আশা অমর, হয়তো অমৃতও।

শুধু নির্ভরহীন আশা নয়, শুধু স্বপ্ন নয়। নিব্যূঢ় নির্বিশেষ নিঃসংশয় মানবধর্মেও ৎসোয়াইগ্ বিশ্বাসী। তাই জর্মন সেনানী পাশ্কে-র মাঝে মাঝে মনে হয়, ওপারের অপরিচিত রুশ সৈন্যও হয়তো অভিন্ন একাত্ম বন্ধু। তাই কার্ট বোল্থ-এর দু-ফোঁটা রক্ত দেখে অপরিচিত ইংরেজ ক্রেতা বিচলিত হয়ে ওঠে—অনেক রক্ত দেখেছে সে—আর সহ্য হয় না। কিন্তু টাঁকশালের রৌপ্য মুদ্রাই কি মানুষের রক্তের দাম? তবু সান্ত্বনা, অনুকম্পার সেতুতে ভ্রাতৃত্বের আলো পারাপার করবে।

মুক্তির আরো পথ আছে। 'সাপ' গল্পে প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী গাইগেলাঙ-এর নাগপাশ থেকে অটো মূলাকার নিজেকে মুক্ত করে; মরা সাপের ভয় দেখিয়ে লোকটাকে মারতে হয়। মনে হয়, এ-গল্পে আরো একটা অর্থ আছে। নাৎসীতন্ত্রের কুৎসিত অভ্যুদয়ের মুখে দাঁড়িয়ে এ-যেন এক অর্থভাস্বর ইঙ্গিত। খড়্গনাসা শকুন-নেত্র রোগাটে মুখ—মানসিক বিকারেরও আভাস আছে—গাইগেলাঙ-এর মুখের পাশে আরো একটা মুখ ভেসে ওঠে—হিটলারের মুখ। হিটলারের ক্ষমতাপ্রাপ্তির প্রাক্কালে জর্মন নৃতত্ত্ববিদ ম্যাক্স ফন হুবার-এর জবানী: "বিশ্রী নাক, ঠেলে বেরিয়ে-আসা গণ্ডাস্থি, ছোট চোখ। লোকটাকে দেখলে মনে হয় যেন নিজের উপর অধিকার নেই, মানসিক বিকারগ্রস্ত।" নিজের সাধুতার সপক্ষে গাইগেলাঙ-এর যুক্তি, "যেহেতু আমি খ্রাক্সন—"; হিটলারের মুখেও প্রায় একই যুক্তি, "যেহেতু আমি আর্যবংশজাত—"। বহুদিনের অবহেলিত নিম্নমধ্যবিত্ত ও কৃষককে সহসা সম্মানের আস্বাদ দিয়ে হিটলার কিস্তিমাত করেছিলেন; হের গাইগেলাঙ-ও সে-কায়দায় রপ্ত। তাই তার মুখের লাগোয়া বুলি, "হের ডাইরেকটর", সেখানে পাত্রবিচারের প্রশ্নই ওঠে না। সংকটকালের

অর্থনীতির প্রতিবেশে দাঁড়িয়ে নয়া প্রভাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে হিটলার নি ঘোষণা করেছেন, অর্থনৈতিক দুর্বিপাকের তামাম অভিশাপ থেকে জাতিকে আমি মুক্তি দেব। গাইগেলাঙ-ও সেই পথই ধরেছে। মুদ্রাস্ফীতির বিষদাঁত যখন দেশটার গায়ে চেপে বসেছে, তখনও কী স্পর্ধায় গাইগেলাঙ বলে, যে যা-খুশি দাম হাঁকুক, আমি তার তিন ভাগের এক ভাগে কাজ সেরে দেব। অথচ পরে, এই গাইগেলাঙ-ই অসন্দিহানকে প্রতারণা করে, অনন্তসুখের প্রতিশ্রুতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে না এনে দেয়; সব-কিছুই করে সজ্ঞানে, পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্তের পদে-পদে অনুসরণে।" আগে মারলে ফিরে মার খেতে হবে। মূলাকার য় দেখাতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই ভয়েই গাইগেলাঙ-এর অপমৃত্যু ঘটল। দরবারে মূলাকারের শাস্তি হয় নি। "আর, যদি তার নিজের বিবেকের প্রশ্ন ওঠে, সেখানেও মূলাকার জিতে গেল—কারো হস্তক্ষেপ, কারো সাহায্য, কারো উপদেশের দরকার হয় নি।" অটো মূলাকার নিরপরাধ—অন্যায়ের শোধ তুললে পাপ নেই। মূলাকারের পাপেও অসংখ্য মুখ ভেসে ওঠে—াঙ্গনের আঘাতে পঙ্গু বিশ্রামাভিলাষী নীড়-সন্ধানী মূলাকার একা নয়—ুদ্ধ ক্ষতবিক্ষত সমগ্র জর্মন জাতি সেদিন একই স্বপ্ন দেখেছিল, একই সঙ্গে সেই চতুর খেলোয়াড়কে বড় সহজে বিশ্বাস করেছিল, বঞ্চনায়-অপমানে একই ফল ভাগ করে নিয়েছিল। দুঃসময়ের যখন শুরু, তখনই পরিণতির ছায়া দেশে কানে কানে প্রতিশোধের ডাক পৌঁছে দিয়েছেন আর্নল্ড ৎসোয়াইগ্! গাইগেলাঙ-এর মৃত্যুতে শোকাশ্রু নেই; অনবধানে নরহত্যাতেও মূলাকারের অনুশোচনা নেই। গভীরতর তাৎপর্য অস্বীকার করলে এটা নিষ্ঠুর মনে হয়। ইতিহাসের অর্থে অর্থ খুঁজলে সেই তাৎপর্যে পৌঁছনো যায়। গাইগেলাঙ-হিটলার অভিন্ন নয়; মূলাকার-ও প্রতীক নয়। তাদের সংঘাতেই যা-কিছু প্রতীকতা।

"দুঃসময় থেকে সুসময়ে মানুষ পৌঁছে দেবে মানুষকে।" এ-প্রত্যয়ে ৎসোয়াইগ্-এর আস্থা অটল। স্বপ্ন মানুষকে ছাড়ে না, স্বপ্নকেও সম্ভব করা যায়, আর, আশা অবিনশ্বর—তাই ঐ-প্রত্যয়ও অনড়। সংকটের যুগকে স্বীকার করেও সুদিনে উত্তরণের সঙ্কল্প-ঘোষণা—এটাই যেন ৎসোয়াইগ্-এর গল্পসংগ্রহের বাঁধা সুর। স্বপ্ন নানারূপে তাঁর গল্পের চৌকাঠ মাড়িয়েছে। র্নার্ট ফিগুল-এর স্বপ্ন, হের গানাৎস্-এর স্বপ্নের মতোই ইঙ্গবার্ট মাউকনার-এর

জীবন ও স্বপ্ন কোনো এক দুর্লভ মুহূর্তের রূপাদৃষ্টিতে একাকার হয়ে যায়। মদের বোতলের ছিপিটাকে জোর করে খুলতে গিয়ে অক্ষিপটের একটা শিরা হঠাৎ একদিন ছিঁড়ে গেল। বাঁ চোখের ঘোলাটে দৃষ্টিতে পৃথিবীর রূপটাই পাল্টে গেল। হঠাৎ বোঝা গেল, পৃথিবীর বহুরূপে প্রকাশ; বোঝা গেল, হয়তো আরো একটা সত্য আছে, আরো বড় সত্য। সুস্থ দৃষ্টিতেই ভালো কাজ চলে; কিন্তু এই বিকৃত দৃষ্টির এই-যে দেখা, একি মিথ্যা? মাউকনার-এর চোখে পৃথিবীর ছবিটা খাঁজে-খাঁজে ফুটো-ফাটায় ভরে গেছে। হয়তো সব-কিছুরই আরো একটা দিক আছে, হয়তো বাঁ-চোখের দেখাটা ডান-চোখের দেখার চেয়ে অনেক বেশি সত্য। জীবনের নিত্যকালের জানা ছবিটাকে সরিয়ে দিয়ে এই স্বপ্নলোক রচনা—"হয়তো"-র রূপকথালোকে এই উত্তরণ—জীবনে এর দাম আছে—ইউটোপিয়া-র স্বপ্ন দেখারও দাম আছে। কেননা, সে স্বপ্ন জীবনের অর্থ আনে, জীবনে পথ দেখায়। স্বপ্ন তাই নির্বীজ নয়।

পুস্তক পরিচয়

মুখের রেখা ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ। ত্রিবেণী প্রকাশন। সাড়ে পাঁচ টাকা ॥

মুখের রেখার ভূমিকায় লেখক বলেছেন এ উপন্যাসটি ঘটনাপ্রধান নয়, ভাবনা-প্রধান। বলেছেন যে নায়ক এ উপন্যাসে বিচার করে দেখতে চেয়েছে তার অভিজ্ঞতার মূল্য। "জীবন কেন এ প্রশ্ন স্বতঃই তার মনে উঠেছে। এবং উত্তরও সে খুঁজেছে।" এই ভাবনা-প্রধান জীবনার্থ-সন্ধানী উপন্যাসের নায়কের নাম সৌরেশ। সৌরেশের স্ত্রীর প্রসব-বেদনায় যখন জীবন সংশয়াপন্ন তখন শঙ্কা-উদ্বেগ-দুশ্চিন্তায় বিষণ্ণ নায়ক স্মৃতিচারণায় রত হলেন। সেই স্মৃতিবিহারের ফল এই উপন্যাস। বালক সৌরেশ যার ডাক নাম টুলু, যুবক সৌরেশ যার ডাক নাম সৌর, এবং বয়স্কদেহী ও বয়স্কমনা সৌরেশ—এই ত্রিভুজে উপন্যাসের কাঠামো বিরচিত। টুলু-মোহিতদা-লিলিদি এ উপন্যাসের প্রথমাংশ, সৌর-বিজন-লতাবৌদি এ উপন্যাসের দ্বিতীয়াংশ, সৌর-নয়ন-পাখি প্রভৃতি এ উপন্যাসের তৃতীয়াংশ। সতী এ কাহিনীর উপসংহার। মানুষের মধ্যে যে প্রতি মুহূর্তের মৃত্যু আর প্রতিমুহূর্তের জন্ম ঘটছে, এখনকার আমিকে ছাড়িয়ে যে প্রতিমুহূর্তে আর এক আমি গড়ে উঠছে সেই মৃত্যুবাসনা আর জন্মবেদনা এ উপন্যাসে লেখকের প্রধান বিষয়। সৌরর জীবনের ফ্রেমে এই বাসনা বেদনাকেই রূপান্বিত করতে চেয়েছেন সন্তোষবাবু। সতীর প্রসববেদনা এবং একটি কান্নার জন্মদান সে অর্থে প্রতীক ঘটনা। সৌরেশের নীল বিষের শিশি ছুঁড়ে ফেলায় মৃত্যু বাসনার ক্ষণিক মৃত্যু—একটি কান্নাকে জন্ম দিয়েও তেমনি বধূ-সতীর মৃত্যু। জন্মলব্ধ কান্নার শিশুও জীবনের নানা ছকে মরতে মরতে অনেক জন্মের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাবে—শেষ পর্যন্ত কোথাও কোনো বিশুদ্ধ 'আমি' গড়ে উঠবে না। নিঃসন্দেহে লেখকের অভীপ্সিত বিষয় অনন্যসাধারণ। এখন দেখা যাক লেখক এই উচ্চাভিলাষী বিষয়বস্তুর সদ্ব্যবহার করেছেন কীভাবে, বর্তমান কালের অস্তিত্ববাদী দর্শন প্রভাবিত জীবনদৃষ্টিকে লেখক কীভাবে শিল্পে রূপায়িত করেছেন।

স্বপ্নে, চিন্তায়, কথায় এই উপন্যাসে নানা প্রসঙ্গে মৃত্যুবোধের ছায়াপাত ঘটেছে। এই মৃত্যুপ্রসঙ্গের ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি পূর্ব অনুচ্ছেদে কথিত সন্তোষবাবুর বিষয়বস্তুর অনুসারী। যদি এই মৃত্যুবোধের উল্লেখ লেখকের জীবনার্থের অমোঘ আকর্ষণের সঙ্গে জড়িত থাকত তাহলে অবশ্যই তা বড় শিল্পকর্ম বলে পরিগণিত হতে পারত। টুলুকে লেখক প্রথমে স্মৃতিসূত্রের সাহায্যে আমাদের সঙ্গে পরিচিত করালেন এই বলে যে সে অস্থির এবং অশান্ত। সে যে কত অস্থির আর অশান্ত তা তার শোবার ধরনেই বোঝা যেত। অথচ পরের পর্যায়ে টুলুর পূর্ণাবয়বে দেখা গেল যে সে নিরীহ, রুগ্ন, তার বাইরে ঘোরা বারণ, সে ইনট্রোভার্ট! টুলুর এই চেহারাটা খাঁটি। কেননা রুগ্ন নিরীহ বালক যেভাবে ঘরকুনো শান্ত জীবনযাপন করে তাতে তার ইন্‌ট্রোভার্ট হয়ে গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। ভবিষ্যৎ সৌর ও সৌরেশের অন্তর্মুখী জীবনের, স্বভাবের ভূমিকাও এখানেই সন্ধেয়। সুতরাং এই স্বাভাবিক ভূমিকাটুকুকে সন্তোষবাবু "কত অশান্ত আর কত অস্থির" এই মন্তব্যে প্রায় বিনষ্ট করতে বসেছিলেন—মন্তব্যটি ছোট বলেই তাদৃশ ক্ষতিকারক হয় নি। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ত্রুটি আসলে একটা বড় অসঙ্গতির বহির্লক্ষণ। সেই বড় অসঙ্গতির জন্য মৃত্যু প্রসঙ্গ এ উপন্যাসে শিল্প ও জীবনের পরস্পর অন্বয়ের সঙ্গে জড়িত না হয়ে, হয়েছে আরোপিত। সেই অসঙ্গতি হল লেখকের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায় বিধৃত বিষয়চেতনার সীমিত রূপ ও উচ্চাভিলাষী বক্তব্যের মধ্যস্থিত অসঙ্গতি।

ভাবনা-প্রধান উপন্যাস কখনো কাহিনীপ্রধান উপন্যাসের মতো পাঠক মনের কৌতূহল বৃত্তির পরিচর্যা করে না। কিংবা আরো ঠিক করে বলতে গেলে বলতে হয় যে ভাবনাপ্রধান উপন্যাসের বেলায় পাঠকের যে কৌতূহল বা আগ্রহ তা নায়কের ভাবনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। নায়কের হয়ে ওঠা, বা গড়ে ওঠার ইতিহাস—অবশ্যই মানসিক ইতিহাস—এখানে পাঠকের মনকে টানে। তার জন্যে লেখকের অন্তহীন অভিজ্ঞতার পশরা নিয়ে বেসাতি খুলতে হয় না। লেখকের অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশিষ্ট মানস্ পরিবেশ এক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন এবং প্রধান প্রয়োজন। সন্তোষবাবু সেই মানস পরিবেশ গড়ে তোলার কোনো সুষ্ঠু আয়োজন না করেই মৃত্যু বিষয়ক তাঁর নিজের বক্তব্যগুলি যথাতথা জানিয়ে দিয়েছেন। দেখা যায় কী এক আশ্চর্য নিয়মে এই উপন্যাসের সৌর ছাড়া বাকি সব মানুষগুলির জীবন ব্যতিক্রমের জীবন। সাধারণ জীবনের প্রতি মুহূর্তের সংঘাতে একটি মন্ময় চেতনা জীবন থেকে কী পেল

সে কাহিনী এ উপন্যাসে নেই। নানান অস্বাভাবিকতার সঙ্গে একটি মনের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় কাহিনীই হয়ে উঠেছে এর প্রধান উপজীব্য। এক-একটা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে ছোটগল্পের মতো এক-একটা সংবাদ বা চমক বা গোপন তথ্য উন্মোচিত হবার বিস্ময় ছাড়া নায়কের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এবং সে অভিজ্ঞতাগুলিও আবার একের সঙ্গে অপরে পৃথক এই যা, বাস্তবিক এগিয়ে দেবার মতো অভিজ্ঞতা একটিও নয়। ফলে হয়তো এক-একটি পৃথক কাহিনীর আকর্ষণ আছে। কিন্তু উপন্যাসের সমগ্র আকর্ষণ নেই। এর অভাবেই উপসংহারের দার্শনিক আত্ম-জিজ্ঞাসা লেখকের জানা কথার আবৃত্তি হয়ে গেছে মাত্র।

প্রথম ধরা যাক টুলু-মোহিত-লিলি অধ্যায়ের কথা। রুগ্ন নির্জীব টুলুর কাছে মোহিত উদ্দাম স্বাস্থ্যবান জীবনের প্রতীক। মোহিত আর লিলির সামান্য সম্পর্কের মাধ্যমে এবং লিলির কাছে টুলু পড়ত এই সূত্রে লিলির মায়ের জীবনের রহস্য টুলুর কাছে ফাঁস হয়ে গেল। টুলু আড়াল থেকে লিলির মায়ের কলঙ্ক কাহিনী সব শুনে ফেলল, সব মনে রাখল এবং পরবর্তী সৌরেশের ডায়েরির সাহায্যে সেই শোনা কথাগুলি ব্যাখ্যা করল। আমরা টুলুর কৈশোরের সোনালী-অজ্ঞতাকে ভাল করে চিনতে না চিনতেই লিলিদির মায়ের গল্প আড়াল থেকে শুনে টুলু অজ্ঞতার আবরণ ভেঙে ফেলল এই বার্তা শুনলাম। সেই একটি সন্ধ্যাতেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে যে ফাঁকি থাকে সেটা সে বুঝতে শিখল। লিলির মায়ের জীবনের ঘটনার মতো অস্বাভাবিক ঘটনার সাহায্যে টুলুর মতো নিরীহ ছেলেকে জীবনের প্রথম পাঠ দিতে যাওয়ার জটিলতা অনেক। টুলুর নিজের সব শোনা-কথা—দীর্ঘ বাক্য-বিনিময়—নিখুঁতভাবে মনে রাখা চাই—এবং সেই সব শোনা-কথার মানে টুলুর পক্ষে বোঝা অসম্ভব বলেই পরবর্তীকালের সৌরেশের ডায়েরি খুলতে হয়। টুলুর শোনা-কথা পরবর্তীকালের সৌরেশের ডায়েরির সাহায্যে ব্যাখ্যাত হলে এই অধ্যায়ে টুলু কী পেল সেটাও আমাদের কাছে শোনা-কথা হয়ে যায়। টুলুর প্রথম স্মরণীয় অভিজ্ঞতায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথাটাই বা আদৌ ব্যবহৃত হবে কেন সে প্রসঙ্গ না হয় বাদ দিলাম। এই অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে টুলুকে উদ্ধার করার জন্য লেখককে নানা উল্টোপাল্টা কথা বলতে হয়েছে। বলতে হয়েছে—"সে মরে যাচ্ছিল। মোহিতদা সব বুঝেছেন, সে কিছুই বোঝে নি।" "আড়ালে যা ঘটল সেটার প্রকৃত

তাৎপর্যটুকু বুঝতে পারে নি।" "একেবারে বোঝে নি তা নয়, টুলু সেদিনই বুঝেছে, অস্পষ্টভাবে।" এই এলোমেলো কথাগুলি টুলুর নতুন কিছু হয়ে ওঠার কোনো আভাস বহন করছে না, এ শুধুই টুলুর একটা অভিজ্ঞতা। তাও টুলুর পরবর্তী বুদ্ধির আলোকে ব্যাখ্যাগম্য—নতুবা নয়।

এর পরেই দুটো আশ্চর্য স্বপ্নের স্মৃতি দিয়ে টুলুর মনকে সৌরেশ ব্যাখ্যা করেছেন। সন্তোষবাবুর চমৎকার গদ্যে স্বপ্নস্মৃতি দুটি সুন্দরভাবে এসেছে। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে টুলুর কিশোর মনের সন্ধিক্ষণকে লেখক মূর্ত করে তুলেছেন শিল্পসুন্দরভাবে। কিন্তু এই সুন্দর অংশটুকু পার হয়েই পাঠকের মন আর একবার ধাক্কা খাবে টুলুর বাবা-মায়ের ইতিবৃত্তে। লেখকের হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে টুলু বা সৌর বা সৌরেশের মধ্যে জিজীবিষা এবং মরণেচ্ছার প্রাবল্য লেখকের অভীপ্সিত শিল্পবক্তব্য। সেই মরণেচ্ছাকে উপন্যাসে তথা সৌরেশের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অথচ টুলু-সৌর-সৌরেশের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার যাত্রায় ধীরে ধীরে সে মৃত্যু ইচ্ছার জন্ম এবং গড়ে ওঠাকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে যে শ্রমসাপেক্ষ শিল্পকর্মে তদ্গত হওয়া প্রয়োজন তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় পাওয়া গেল না। শুধু অনেকগুলি অস্বাভাবিক জীবন-কাহিনীর শ্রোতা সৌরেশের পিতামাতার যুগলে আত্মহত্যার কাহিনীতে এই মৃত্যুইচ্ছার বীজ কল্পনা করতে হয়েছে। অতঃপর সন্তোষবাবু সৌরর বাবার ডায়েরি বার করে সৌরর বাবার কাহিনীর বিষয়ে আমাদের অবহিত করেছেন—টুলুর জন্মের আগের গল্পও আমাদের গোচর হয়েছে। সে ডায়েরির সাহায্যে আমরা যা জানতে পারি তা একেবারেই তাৎপর্যহীন। দিদি বুলুর অসুখের সময় বাবা আর মা দীর্ঘ বিরতির পর হঠাৎ যৌন আকর্ষণের টানে মুমূর্ষু বুলুকে ফেলে বাইরের অন্ধকার বারান্দায় চলে গেলেন। ফিরে এসে তাঁরা দেখলেন বুলু নিঃশব্দে মরে পড়ে রয়েছে। সংসারে এ রকমও নিশ্চয় হয়—না হলে আর সন্তোষবাবু একথা লিখবেন কেন—কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে শুধু এই আকস্মিক ঘটনাতে দুজনের মনে উদ্ভূত অনুশোচনা আত্মহত্যায় গিয়ে পরিণাম করলে তা তেমন স্বাভাবিক মনে হয় না। এটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। এ কিছুতেই পারিবারিক মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা নয়—বংশ-পরম্পরাগত মৃত্যুবীজের জনকও এ নয়। সৌরেশের মৃত্যুইচ্ছার ভিত্তি রচনার এই অপ্রয়োজনায় ইতিহাসটুকু না বললেই লেখক সংযমের পরিচয় দিতেন। "ভাবনাপ্রধান" উপন্যাস লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে

য়েরির সাহায্যে ব্যাখ্যাপ্রধান উপন্যাস লিখতে হত না তাঁকে। তাছাড়া ৌরর বাবার ডায়েরির ভাষাও ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রায় টুলুর জন্মের সঙ্গেই যে বা মারা গেলেন সেই চল্লিশ বছর পূর্বের প্রৌঢ়ের ডায়েরির ভাষাকে ৎকালবর্তী করার জন্য সঙ্গতভাবেই সন্তোষবাবু প্রয়াস পেয়েছেন। এ জন্যই বাবার ডায়েরিতে লৈখিকক্রিয়া ব্যবহার করা হল। কিন্তু লৈখিকক্রিয়া-ণ্ডিত এই গদ্যকে অচিরেই চকচকে করে তুললেন সন্তোষবাবু, আধুনিক কবিতার উপযুক্ত ভাষার অনুকরণে সেই প্রৌঢ়ের ভাষা আর সন্তোষবাবুর ভাষার মধ্যে কোনো তফাত নেই। "তক্তাপোশটার নিচে খানিকটা শরণার্থী ফেরারী অন্ধকার, মূক এবং আড়ষ্ট, শিকারী দিন তাহার নাগাল পায় নাই।" কী চমৎকার চিত্রকল্প। কিন্তু এই চমৎকার চিত্রকল্পকে যাঁর মনের ফ্রেমে স্থাপন করা হল সেই প্রৌঢ় আমাদের কাছে আচারে-আচরণে, জীবনে-মরণে অস্পষ্টই থাকলেন। ফলত এই চিত্রকল্প রচনা করার শক্তি যে তাঁর আছে পাঠক সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারল না।

এইভাবে সৌরর মানসিক পরিচয়ের স্পষ্ট অভিজ্ঞান গঠনের দিকে উদাসীন লেখক সৌরকে যখন পৌঁছে দিলেন লতাবৌদি-শচীপতি-বিজনের অধ্যায়ে তখনও সৌরর দরকার বিজনের মতো মোহিতের দ্বিতীয় সংস্করণকে। সৌর যেন কিছুই বোঝে না এবং আভাসেও যেন সংসার যে জটিল একথা তার জানা হয় নি। বিজন মোহিতের পরিত্যক্ত ভূমিকায় সৌরর দ্বিতীয় টীকাকার। লতাবৌদি ও শচীপতির জীবনে যে ফাঁক, যে অসঙ্গতি তার সঙ্গে সৌরর চেতনাবিস্তৃতির সম্পর্ক কী সে কথা লেখকেরও অজানা, সৌররও অজানা। সৌর শচীপতির জীবনসংক্রান্ত সকল কথা শোনার পর বিজনের কাছ থেকে বুঝেছে (এই বোঝার জন্য বিজনের ব্যাখ্যাই যথেষ্ট!) যে, লতা আসলে সৌরকে ভালোবাসে না ভালোবাসে সৌরর দেওয়া স্থূল সুখটুকু। সৌরর পক্ষে এটা লতাবৌদির কাছ থেকেই সংগ্রহ হওয়া উচিত ছিল নাকি? লতাবৌদি যখন বুঝিয়েই বললেন যে একের পর এক পুরুষ যুবকের আগমন ঘটেছে তার জীবনে, তা সত্ত্বেও শেষ অবধি শচীপতিই স্থায়ী হবেন—তখনই কি সৌরর মনের মধ্যে জিজ্ঞাসাচিহ্নের উদয় হবে না? তখনও বিজনের ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা দরকার? লতাবৌদি গল্প শেষ করে সৌরর মুখের ওপর আনত হয়ে হাসতে লাগল—তার জন্য গল্প শোনার পর সৌরর মনে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। এবং প্রতিক্রিয়া যে নেই এই বোধ থেকে

সৌর এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হল না যে তার ভালোবাসাও তাহলে স্থূল সুখেরই সন্ধানী—কেননা, তা না হলে লতাবৌদির গল্পের পর লতাবৌদির কাছে তার নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে সে প্রশ্নাকুল হয়ে উঠত।

এক, লিলিদির মায়ের জীবনরহস্য, দুই, সৌরর বাবার মৃত্যুরহস্য, তিন, লতাবৌদির দাম্পত্যরহস্য—এই তিন রহস্যের পর সৌরর জন্যে অপেক্ষা করছিল চতুর্থ রহস্য। দেহজীবিনীদের মনের রহস্য। নয়ন পাখি প্রমুখ মেয়েদের সঙ্গে সৌরর পরিচয় ঘটল। তাদের ইচ্ছে ছিল সৌরকে খারাপ করে দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৌরকে খারাপ করা যায় নি, নিজেরাও ভালো হয় নি, কারণ—সৌরর ব্যাখ্যা হল—কেউ কিছু হয় না যে যাই থাকে তাই থাকে। আশ্চর্যের বিষয় সন্তোষবাবুর সৃজিত বাঙালীদেহজীবিনী অশিক্ষিত মেয়েরা 'কঁতিনতাঁল' কায়দায় হাতে চুমু খায়—কেতাদুরস্তভাবে। বলা বাহুল্য এ অধ্যায়েও চিত্তবাবু, মালা, নয়ন-পাখির গল্পে সৌর কোথায় পৌছল তার নির্দেশ নেই। মালার মৃত্যু বড় জোর একটা শোচনীয় ঘটনা। সুতরাং এই নায়ক যখন সতীর সঙ্গে তার সম্পর্কের অধ্যায়ে গিয়ে উপনীত হল তখন পাঠকের মনে স্বভাবনিয়মে এক কৌতূহল গজিয়ে উঠেছে—অতঃকিম্? সতীর মাথায় ছিট আছে, সে ঘুমের ঘোরে ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং যাকে সৌর নিশীথ রাত্রে ছুঁয়েছে সে একটা অচৈতন্য শব ছাড়া কিছু নয়। সৌর নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কেননা একমাত্র ভালোবাসা মিথ্যে হয়ে গেল যে। যাই হোক নিরুদ্দেশ যাত্রা থেকে ফিরে এসে সতীর সঙ্গেই তার বিয়ে হল। সতী তাকে ঘর চেনাল।

সেই সতীর প্রসববেদনার রাত্রে সৌরর হঠাৎ মনে হল সে বড় ক্লান্ত। "প্রায় প্রৌঢ় যে পুরুষ অনেক লড়াই করে বেঁচে এল"—তার ক্লান্তি, তার ইচ্ছা পূরণের প্রশান্ত শান্তি তাকে বিষের শিশি হাতে তুলে দিল। কিন্তু অনেক লড়াইয়ের বিবরণ কোথায়? সাক্ষ্য কোথায়? সৌরকে গড়ে তোলাই হয় নি এ উপন্যাসে। অনেক লড়াইটা দেখলাম বা অনুভব করলাম কোথায় আমরা? লিলির মায়ের কাহিনী আড়িপেতে শুনে ফেলায়, বাতায়নবর্তিনীর উদ্দেশে অক্ষম পত্র রচনায়, না লতাবৌদির কোলে মাথা রেখে গল্প শোনায়? তাতেই ক্লান্তি, এবং তাতেই পূর্ণতা! প্রথম থেকে বাবা আর মায়ের মৃত্যুর গল্প থেকে মৃত্যুচিন্তার যোগান এবং বিষের শিশি ফেলে দেওয়ার সমস্তটাই শেষ পর্যন্ত অর্থহীন। ফলত শেষ কয়েক পাতার অস্তিত্ববাদী সিদ্ধান্ত কিছুর ওপরই দাঁড়াল না।

ভূমিকা-পত্রের পরের পৃষ্ঠায় লেখকের গ্রন্থতালিকা পড়ছিলাম। অনেক দিন বাদে 'কিছু গোয়ালার গলি' প্রভৃতি বইগুলির কথা মনে পড়ল। তাতে দুঃখ বাড়ল বই কমল না।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঠকগোষ্ঠী

সমালোচকের দায়িত্ব

পৌষ-সংখ্যা পরিচয়ে অশোক রুদ্রের 'পরিচয় ও সাহিত্যিক দায়িত্বহীনতা' নামক সমালোচনা-প্রসঙ্গে গত কয়েক মাস নানা রকম মতামত পরিচয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আমার আশা ছিল, আলোচিত লেখক-চতুষ্টয়ের মধ্যে কেউ এ-বিষয়ে আলোচনা করবেন। ইতিমধ্যে বাকি তিনজনের কেউ কিছু না লেখায় নিজেকেই বাধ্য হয়ে এ বিষয়ে লিখতে হচ্ছে। কারণ অশোকবাবু সাহিত্যিকের দায়িত্ব, পরিচয়, আমাদের লেখা প্রসঙ্গে এমন গুরুতর কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—যাতে বোঝা যায় মার্কস্‌বাদী মহলে ঐ তিনটি বিষয় নিয়ে অত্যন্ত মারাত্মক রকমের মতভেদ বর্তমান। কারণ আমাদের "দায়িত্বহীনতায়" "প্রগতির একটি মাত্র দীপ শিখা" পরিচয়ের নিভে যাওয়ার সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে সে-বিষয়ে সোজাসুজি আলোচনা উত্থাপন করাই উচিত। এই কাজটি অশোকবাবু করেছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের চারজনকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অশোকবাবু আমার ইছামতী গল্পটিকে সামান্য কিছু নম্বর দিয়েছেন। তাতে বোঝা যায় তাঁর মনে এই ধরনের গল্প সম্পর্কে কিছু সহানুভূতিও বর্তমান। এখন বিচার করা দরকার অশোকবাবু তাঁর সীমাবদ্ধতা উত্তীর্ণ হবেন, নাকি আমরাই তাঁর সহানুভূতির আশায় সীমাবদ্ধ হবার চেষ্টা করব।

তাঁর বক্তব্যকে তিন ভাগে সাজানো যায়—প্রথমত মার্কসবাদী সাহিত্য-বিচারের নিরিখে আমরা পতিত; দ্বিতীয়ত আমরা ঐতিহ্যহীন; তৃতীয়ত আমাদের 'চেতনাপ্রবাহী' লেখাগুলোর বিষয়, ভাষা ও শৈলী—শূন্যমূল্য। আমিও অশোকবাবুর প্রবন্ধের এই পর্যায় ভাগকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করব।

এক

অশোকবাবু বাংলা-সাহিত্যে সাহিত্যের মার্কসবাদী নিরিখ প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেছেন—খ্রীষ্টধর্ম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মার্কসবাদ এই

তিনটিই আধুনিক বিশ্ববীক্ষা। খ্রীষ্টধর্ম ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বলেছেন—"প্রগতিগত ভূমিকা আর বাকি নেই কিন্তু মূল্য সংরক্ষণের ক্ষমতা তাদের এখনও নিঃশেষ হয় নি।...মৃত্যুর মুখেও ইউরোপের সমাজে এখনো অনেক মূল্য অবশিষ্ট রয়েছে।" সুতরাং তাঁদের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী বিচার অপরিহার্য নয়, অথচ "আমাদের সমাজ-মানসে এমন আর কিছুই বাকি নেই যার সাহায্যে মানুষ অর্থপূর্ণ ভাবে বাঁচতে পারে...। আমাদের সমাজ আজ তাই সম্পূর্ণই শূন্য মূল্য।" বাংলাদেশে ক্যাথলিক ধর্মও নেই, লিবারেলিজমও নেই, তাই মার্কসবাদের দায়িত্ব বাংলাদেশে অনেক বেশি।" নিজে মার্কসবাদী হয়েও অশোকবাবু এই দীনতা প্রকাশ করলেন কেন? মার্কসবাদের দায়িত্ব পৃথিবীর সর্বদেশেই সমান—ইংলণ্ডের লিবারেলিজম, ইতালি বা ফ্রান্সের ক্যাথলিক ধর্ম মার্কসবাদের কাজ করতে পারে না। সুতরাং আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রেই বিশেষ করে মার্কসবাদী বিচার কেন, মার্কসবাদী হিসেবে সমস্ত সাহিত্যকেই একই মানদণ্ডে বিচার করা উচিত। আমার অনুমান অশোকবাবুর অপরাধবোধ থেকেই এই কৈফিয়তটি বেরিয়ে এসেছে। অতীতে বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর দু-একটি রচনায় যে সহিষ্ণুতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন—আমাদের ক্ষেত্রে তার অভাব সম্বন্ধে তিনি নিজেই সচেতন। তাই অশোকবাবু গোড়াতেই বলে রাখলেন—মার্কসবাদের জন্যই আমি এত রেগে গেছি—আমাদের "দায়িত্বহীনতায়" "প্রগতির একটিমাত্র দীপশিখা" যখন নিবু-নিবু বলে অশোকবাবু আতঙ্কিত, তখন পৃথিবীর সর্বোত্তম প্রগতিবাদী দর্শনকে নিজের দুর্বলতার সমর্থনে ব্যবহার করে অশোকবাবু আমাদের অভিভূত করেছেন।

আর, অশোকবাবু মার্কসবাদ-ব্যতীতও যে দুইটি জীবিত বিশ্ববীক্ষার সন্ধান দিয়েছেন—তা কি মার্কসবাদ-সম্মত? সত্যি করেই কি এখনো খ্রীষ্টান ধর্মের মূল্য সংরক্ষনী ক্ষমতা আছে? কেনেডির নির্বাচনের সময় রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মের জিগির তোলা বা ভারত-সফরকালে দ্বিতীয় এলিজাবেথের গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করাই কি বিশ্ববীক্ষা নাম পাবার যোগ্য। ইউরোপের যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ, যথা ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক, ধর্ম-বিশ্বাসী—তাঁদের রচনার শিল্পমূল্য কি? অশোকবাবুর প্রিয় লেখক সার্ত্রের উক্তিটি তিনি নিশ্চয়ই ভোলেন নি, "ঔপন্যাসিক মরিয়াক ঈশ্বরের মতো, এবং ঈশ্বর কোনো শিল্পী নন।" অভি-সম্প্রতি মরিয়াকের স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে কবিত্ব আছে,

[illegible]কতা আছে—নেই জীবন—যা একজন শিল্পীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম-বিশ্বাস মরিয়াকের মতো ক্ষমতাশালী লেখকেরও এমন কোনো মূল্যবোধ সংরক্ষণ করতে পারে নি, যার দ্বারা নতুন কোনো সৃষ্টি [illegible]। আর তরুণতরদের ধর্ম-বিশ্বাসের কথা না বলাই ভালো। তাঁদের [illegible]নে দুটো পথ খোলা—ধর্ম ও মার্কসবাদ। বিশ্বাস করতে তাঁরা এত ভয় [illegible] যে—এ দুটোকেই বরখাস্ত করেন। কারণ এ বিশ্বাসের ভার বহনের [illegible] আত্মবিশ্বাস তাঁদের নেই। তবু এর মধ্যে ধর্ম একটি মৃত-বিশ্বাস—[illegible]ভাবে জীবিত মার্কসবাদ গ্রহণের অক্ষমতা থেকেই তাঁরা এই ধর্ম-বিশ্বাসের [illegible] কাঁধে বেতালে নাচছেন। তাকে কি বিশ্বনৃত্য বলব? আজকের [illegible] ইংরেজ লেখক সোচ্চারে মার্কসবাদ ও খ্রীষ্টানধর্ম দু-কেই নস্যাৎ করেন—"At some periods these things are readily available: Spain and its Committees, Abyssinia, unemployment, the rise of Fascism, and so on. The Communist solution to such problems has at-least two well-known attractions. First, it offers certainty in the baffling flux, not only of politics, but of life in general.... This, obviously enough, is the link between Marxism and that other system of answers to all the intellectuals questions—Dogmatic Christianity. (*Socialism and the Intellectuals*: Kingsley Amis)। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে খ্রীষ্টানধর্ম এমিল ব্রুনার এবং কার্ল বার্থ প্রভৃতি ইউরোপীয় ধর্মতাত্ত্বিকের নতুন ব্যাখ্যার ফলে এবং রুডলফ বুল্টমান ও লাইটফুট প্রভৃতি কর্তৃক নতুন শাস্ত্রীয় বিচারের ফলে—দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো একটা পোশাক পরতে পেরেছে। কিন্তু এতেই কি প্রমাণ হয় না নতুন মূল্যবোধের চাহিদা মেটাতে পারছে না বলেই তাড়াতাড়ি নিজেকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করছে খ্রীষ্টান ধর্ম? এই শেষ অবস্থার যন্ত্রণা নিঃসৃত নানা প্রকার ধ্বনিকে বিশ্ববীক্ষা নাম কি করে দেয়া যায়। এ-ছাড়া, "মৃত্যুর মুখেও ইউরোপের সমাজে এখনো অনেক-মূল্য অবশিষ্ট রয়েছে"—এই উক্তির পক্ষে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন—সেখানে শিল্পীদের শুদ্ধতা এখনো অটুট আছে। এর উত্তরে [illegible] সংখ্যায় অসিত উপাধ্যায় মহাশয়ের তালিকাটিই যথেষ্ট। বিলাত [illegible] রূপকথার দেশ সম্বন্ধে অনেক ধারণাই এদেশের অর্ধগ্রাম্য মনে এখনো

অটুট। যেমন—সেখানে বেকার নেই, সেখানে অবৈতনিক সার্বজনীন শিক্ষা প্রচলিত ইত্যাদি। অশোকবাবুর শিল্পীর শুদ্ধতা তেমনি একটি ধারণা। তিনি নিজে মার্কসবাদী হয়েও সমাজতত্ত্বের এই প্রথম পাঠটি বিস্মৃত হলেন কি করে যে, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া শিল্পীর "শুদ্ধতা" বজায় রাখা যায় না। লিবারেলিজম সম্পর্কে নতুন করে কী বলা যাবে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যদিও বা লেবার দলের হাতে ক্ষমতা দিয়ে ইংলণ্ড প্রমাণ দিয়েছিল তার দলবিচারের স্বাধীনতার—তারপর থেকেই সেই ইংলণ্ডের সাধারণ-মানুষের সমাজের সঙ্গে সর্ব-সম্পর্কশূন্য-রক্ষণশীল দলের হাতে আত্ম-সমর্পণ করে—কোন্ উদারনৈতিক বিশ্ববীক্ষার পরিচয় বহন করছে সে? আর অশোকবাবু পৃথিবী বলতে ইউরোপ বোঝেন, ইউরোপ বলতে বোঝেন রাইনের পশ্চিম-পাড়। এদেশ থেকে ইউরোপে যেতে হলে ইতালিকে পাশ কাটানোর কোনো উপায়ই নেই বলে—একবার তিনি ইতালির নামোচ্চারণ করেছেন। এশিয়ায়, আফ্রিকায়, লাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে তিনি তাঁর আবিষ্কৃত তিন বিশ্ববীক্ষার কোনটি প্রয়োগ করবেন। এমনকি মার্কসবাদও কি আজ বিভিন্ন ভাষ্যের সম্মুখীন নয়। সুতরাং যে ধরনের সাধারণীকরণ পরীক্ষার খাতায় শোভা পায়, তা দিয়ে একটি "অত্যন্ত তত্ত্বপূর্ণ ও গভীর" প্রবন্ধের ভূমিকা না করাই বোধহয় শ্রেয়। "বাংলাদেশে ক্যাথলিক ধর্মও নেই, লিবারেলিজম্‌ও নেই, তাই মার্কসবাদের দায়িত্ব বাংলাদেশে অনেক বেশি"—ঐ একটি ছোট্ট "তাই"—তাঁর এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিকে অত্যন্ত দুর্বল করে দিয়েছে।

এরপর অশোকবাবু সাহিত্যের মার্কসবাদীরূপ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন (৬৩০-৬৩৩ পাতা)। তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে তিনি বলেছেন মার্কসবাদের মূল-নীতিকে স্বীকার করতেই হবে—যদি একজনকে মার্কসবাদী থাকতে হয়। এরপর আমার গল্পটি বাদ দিয়ে দীপেনবাবু, প্রদ্যোৎবাবু, সত্যবাবুর গল্প তিনটি সম্বন্ধে বলেছেন—"মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির দুটো মূলনীতি এতে লঙ্ঘিত হয়েছে। এক হচ্ছে মানুষকে বাস্তব জগতের কেন্দ্র হিসেবে দেখা, এবং দ্বিতীয় হচ্ছে মানুষকে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করে দেখা।"

অশোকবাবু কৃত সার-সংক্ষেপ দেখে বোঝা গেল, তিনি গল্পগুলিকে কী ভাবে বুঝেছেন। এই বোঝার মধ্যেও যে গোলযোগ আছে তাঁর উক্তিতেই তা ধরা পড়েছে। যেমন ১। ইচ্ছামতী প্রসঙ্গে তিনি পর-পর দুটি বাক্যে

...লেছেন "চালচুলোহীন চার্লির (The Modern Times ছবিতে) পথের ...রি একটা মেয়েকে সাথী করে পথে বেরিয়ে যাওয়ার ছায়া পড়েছে। ...এ ভালো-লাগা একটা হতাশা-বিলাস মাত্র।" মডার্ন টাইমস ছবিটি আমি ...নি। কিন্তু যতটুকু পড়েছি ও শুনেছি, তাতে তো মনে হয় না চার্লি ...নে হতাশা-বিলাসী। বরঞ্চ "হতাশাবিলাস" আর চার্লির পথে বেরিয়ে ...র বীরত্ব—দুটি বিপরীত মেরুতে সংস্থিত। আমাদের নায়কদের বেলায় ...র বীর হওয়া নিষেধ—কিন্তু একই সঙ্গে হতাশাবিলাস আর চার্লি একই ...র উপসংহারে ছায়া ফেলে কি করে—তা আমার বুদ্ধির অগম্য। ...৬৩৩ পাতায় তিনি বলছেন "দেবেশবাবুর গল্পের নায়ক মানুষ, তারা ...তিহাসের ঠিক কোন্ অংশের অন্তর্ভুক্ত তাও মোটামুটি বোঝা যায়।" আবার ...৩ পাতার শেষে লিখছেন "সুধাময় দীপক গোপালের মতো সমাজ-সম্পর্ক-...ন, আশাহীন, উদ্যমহীন, নীতিহীন নায়কদের কোথা থেকে আমদানি করা ...বাংলা সাহিত্যে?"—কত তাড়াতাড়ি অশোকবাবুর "মোটামুটি" বোঝা ...ল্টে গেল। নইলে "ইতিহাসের…অন্তর্ভুক্ত" বলে তিনি যে দীপককে ...তে পেরেছিলেন তাকেও "সমাজ-সম্পর্কহীন" বলে বসলেন কি করে!

এ-রকম ছোটখাটো ভুলচুকের কথা বাদ দিয়েই না-হয় দেখা যাক—গল্প-...লোচনা করায় অশোকবাবু কতটা যুক্তিনিষ্ঠ। পূর্বেই উল্লেখ করেছি—...মার গল্প ব্যতীত বাকি গল্প তিনটি সম্বন্ধে তাঁর অভিযোগ সেখানে "মানুষকে ...র জগতের কেন্দ্র হিসেবে দেখা—" মার্কসবাদের এই মূলনীতি নাকি লঙ্ঘিত ...য়েছে। ব্যাখ্যার দ্বারা অভিযোগ প্রকাশের পূর্বেই অশোকবাবু বললেন ...দের আর্থিক ও সাংসারিক অবস্থা যে কতটা জটিল ও হতাশাজনক তা-...ভালভাবে আঁকা হয়েছে।"—অতএব অশোকবাবু নিজেই স্বীকার করলেন ...াস্তবতা-লঙ্ঘন" এই অভিযোগে গল্পগুলিকে তিনি সম্পূর্ণ চিহ্নিত করতে ...রছেন না। অতঃপর অশোকবাবুর আবার নতুন অভিযোগ (সেই গল্প-...ত অবিমৃষ্যকারী গ্রাম দেশের যুবকের মতো—সদরে যখন এসেছেই খুড়োর ...মে একটা মোকদ্দমা ঠুকতেই হবে—এক নম্বর না লাগে, দু নম্বর)। "তাদের ...রিদ্র্য, তাদের বেকারত্ব তাদের কাছে একটা condition humaine ...সেবে প্রতীয়মান হয়"—সুতরাং "সংগ্রামে জয়ের সম্ভাবনা কখনো অনুপস্থিত ...য়"—গল্পগুলিতে এই কেন্দ্রীয় মার্কসবাদী বিশ্বাসের হানি ঘটেছে। এর উত্তরে ...গুলি একটু বিশ্লেষণ করা দরকার।

চর্যাপদের হরিণী গল্পটির বিষয় কি ? নিশ্চয়ই সুধাময়ের অনিদ্রা, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা ও তার অচেতন মনের প্রতিক্রিয়া দেখানোই শুধু নয়। বেকারত্বের ফলে জটিল আধুনিক একটি ব্যক্তিত্ব সামন্ততান্ত্রিক পারিবারিকতার সঙ্গে মিশ খাবার চেষ্টা করছে, পারছে না—অবশেষে মানুষের সংগ্রামের মিছিলে সে সেই আত্মযন্ত্রণার নদীকে মিলিয়েছে। সারাটা গল্প জুড়ে সুধাময়ের এই আত্মকেন্দ্রিকতার কারাগার ভাঙার মর্মান্তিক যন্ত্রণা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই যন্ত্রণা তার এল কেন—সে যুক্তি-ও লেখক দিয়েছেন—স্বপ্নবৃত্তান্তে। কী করে সেই মহাভারতের কাল থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতবর্ষের মৌল-শক্তিকে পীড়ন করেছে—আর সেই একই পদ্ধতি নতুন রূপ পেয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমলে—পূর্ণ-যৌবনা মঞ্জুশ্রী কলকাতা ধরা দিল না কারোরই হাতে, আর সেই অর্ধসম্ভব শিল্পবিপ্লবের গ্লানিই তো বহন করছে সুধাময় তার রক্তে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, নিরন্তর সংগ্রাম দীপেন্দ্রনাথের মূল-বিষয়। তাঁর নরকের প্রহরী-র ভূতো ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে নরক থেকে। তাঁর ফুল ফোটার গল্পে-র যুবক কত দৃঢ়তার সঙ্গে কত ব্যাপ্ত হতাশাকে জয় করছে। তাঁর কোনো গল্পেই "সংগ্রামে জয়ের সম্ভাবনা কখনো অনুপস্থিত নয়—" এই মূল মার্কসীয় বিশ্বাসের ব্যত্যয় তো নেই-ই, মনে হয়, মোটা দাগে এইটি-ই বলা। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা যথেষ্ট চমকপ্রদ, কিন্তু দুঃখের কথা সকল আকস্মিকতাই বিস্ময়কর সত্য নয়।

আমার কলকাতা ও গোপালের বিষয় কি শুধু একটি উদ্দেশ্যহীন নীতিহীন উদ্যমহীন সংগ্রামহীন আত্মহত্যার কাহিনী ? "দারিদ্র্য বা বেকারত্ব যে একটা সামাজিক সমস্যা"—শুধু ওটুকু চেয়েছিলেন বলেই অশোকবাবু খেয়াল করেন নি তদতিরিক্ত আরো কিছুর চেষ্টা গল্পটিতে ছিল। গোপাল পুরোপুরি একটি সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের ছেলে—অথচ কলকাতার নাগরিকতায় সে লালিত। বাসা তার নগরের মধ্যেও নয়, বাইরেও নয়, নগরসীমান্তে। সমস্যাটা শুধু বেকারত্ব নয়। এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ধনতান্ত্রিক কলকাতা গোপালকে জীবন সম্পর্কে কোনো বিশ্বাসেই বিশ্বাসী হতে দিল না। এখানে একই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ধারণা মানুষকে প্রেরণা দেয়, ধনতান্ত্রিক কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে, আবার, সমাজতন্ত্রের শেষতম বাণী মানুষকে উদ্দীপিত করে। যে-ব্যবস্থায় গোপাল "বাড়তি" বলে ঘোষিত হয়েছে—গোপাল সারাদিন ধরে চেষ্টা করেছে তা থেকে আত্মরক্ষা করতে (এতেই তো সে নতুন ইতিহাসের উপাদান),

পারে নি, অবশেষে মরতে বাধ্য হয়েছে। "গোপাল চাকরি যাওয়ায় আত্মহত্যা করতে মনস্থির করে, কিন্তু তাও একটা উদ্দেশ্যে পরিণত হয় না। …অলসভাবে খামখেয়ালের স্রোতে ভেসে…এগিয়ে চলে…।" গোপাল তো আত্মহত্যা করে নি—সারা কলকাতা ঘুরে ঘুরে অবশেষে ফাঁদে আটকা-পড়া ইঁদুরের মতো মরে গেছে। আর ঐ গল্পটির শেষ বাক্যটির অর্থ অশোকবাবু করেছেন—গোপাল শেষ মুহূর্তেও নিজের কাজের উদ্দেশ্য খুঁজে পেল না। ঐ বাক্যটি অশোকবাবুকে কেমন করে চিন্তিত না করে পারল "গোপাল আত্মহত্যার মানে পেল না, অথচ তবু তাকে মরতে হল কেন ?"

অশোকবাবুর মতে কলকাতা আমাদের বিপক্ষ শক্তি। একটু ভেবে-চিন্তে দেখতে অনুরোধ করি কেন কলকাতা, কেন বিপক্ষতা। আমাদের বর্তমান ব্যক্তি-জীবনের নানা-প্রকার আত্মবিরোধিতার সঙ্গে কলকাতার মতো এত মিল আর কার সঙ্গে। বাংলা-সাহিত্যে অদ্যাবধি কলকাতার চরিত্র পূর্ণমাত্রায় চিত্রিত হয় নি।

কলকাতাকে আমাদের বিরোধী শক্তি হিসেবে না দেখে চারপাশের সামাজিক পরিবেশ হিসেবে দেখলেও কি অশোকবাবু আমাদের নায়কদের সমাজ-সম্পর্কহীন বলবেন। তখনো যদি তাঁর মনে হয় "প্রচেষ্টা বা সংগ্রামের সম্ভাবনার ছায়াও দীপকের (বা সুধাময়ের বা গোপালের) মধ্যে নেই"—তবে এঙ্গেলসের একটি নির্দেশই আমাদের শেষ ভরসা—"আমার মতে লেখক কোন সুনির্দিষ্ট সমাধানের পথ নির্দেশ না করলেও বা কোন বিশেষ পক্ষে যোগ না দিলেও সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত মূলক উপন্যাসের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হতে পারে—যদি সে উপন্যাস প্রকৃত পারস্পরিক সম্পর্কগুলির যথাযথ বর্ণনা দিয়ে সেগুলি সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্তি দূর করে, বুর্জোয়া জগতের আশাবাদ ভেঙে চুরমার করে, এবং বর্তমান ব্যবস্থার শাশ্বত রূপ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগায়।"

এই বিষয়ে কয়েক মাস পূর্বে পরিচয়ে প্রকাশিত আরাগঁর একটি প্রবন্ধের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরাগঁ সেখানে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নয়—যা আমাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে হবে, আমাদের লেখার ভেতর দিয়েই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা গড়ে উঠবে। অন্য কোনো দেশের আদর্শ অনুসরণ করে আর এক দেশের সাহিত্য রচিত হতে পারে না। আরাগঁর মতে ফরাসী সাহিত্যের ক্ষেত্রে রোম্যান্টিকতা এই বাস্তবতার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে।

আসল কথাটি এইখানেই। কীভাবে মার্কসবাদের উদ্দেশ্য সাহিত্যে চরিতার্থ হবেই—এমন কোনো বাঁধা ধরা পথ আগে থেকে নির্দেশ করা অন্যায়। দীপেন্দ্রনাথের চর্যাপদের হরিণী গল্পে—সংগ্রামের জয় এই স্পষ্ট আশ্বাস বাণীতেই প্রগতিশীলতা। আমার কলকাতা ও গোপাল গল্পে—বুর্জোয়া সমাজের আশাবাদ ভেঙে দেওয়াতেই প্রগতিশীলতা। প্রদ্যোৎবাবুর কথা কও গল্পের নায়িকা বিদ্রোহের বাণী উচ্চারণ করে—এইখানেই তাঁর প্রগতিশীলতা। সত্যবাবুর ঘোলা জল নোনা জল গল্পে বর্তমান শ্রেণীব্যবস্থায় সকল স্বপ্নের অপঘাতী অবসান—এই তির্যক তাৎপর্যেই তিনি প্রগতিশীল। অবশ্যই আমরা প্রত্যেকেই সম-ক্ষমতার অধিকারী নই। তাই কেউ কখনো কতকটা সার্থক, কেউ কখনো কতকটা ব্যর্থ। কিন্তু যাঁরা টানা গল্প লিখেছেন তাঁদের টানা পাশ নম্বর দিয়ে, যাঁরা ভাষা-ভঙ্গি-বিষয় নিয়ে কিঞ্চিৎ নতুন চেষ্টা করেছি তাঁদের বেলায় নম্বরের টানাটানি করাটা কি ন্যায়সঙ্গত?

দুই

অতঃপর ঐতিহ্য প্রসঙ্গ। অশোকবাবুর প্রবন্ধে পরিষ্কার করে বলা হয় নি বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বলতে তিনি কী বোঝেন এবং কেনই বা তিনি বললেন, "…এ-ধরনের সমাজ-সম্পর্কহীন, আশাহীন, উদ্যমহীন, নীতিহীন, কেবলমাত্র দিবাস্বপ্ন দেখা নায়কদের কোথা থেকে আমদানি করা হল বাংলা-সাহিত্যে? বাংলাদেশের পথঘাট থেকে নিশ্চয়ই নয়। এসব হল ইউরোপের অবক্ষয়ী সাহিত্যের out-siders!"

প্রবন্ধটিতে অশোকবাবু সার্ত্রর একটি বাণীকে শিরোভূষণ করেছেন, অন্যত্র নানা-প্রসঙ্গে কাফকা, সার্ত্র, হাক্সলি, কামু ইত্যাদি বিদেশী লেখকদের নাম করেছেন। শুধু একবার মাত্র অন্যায় অশ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ ব্যতীত অন্য কোনো বাঙ্গালী লেখকের নামোল্লেখ পর্যন্ত তিনি করেন নি। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রবন্ধের ভাষাই কবিত্বময় নয়। তাঁর প্রথম দিকের গদ্য-রচনা রাজা-প্রজা, স্বদেশ, সমাজ, সমূহ, আত্মশক্তি যুক্তিশীল ঋজু গদ্যের আশ্চর্য নিদর্শন। দার্শনিক প্রবন্ধে ঐ ত্রুটি হয়তো কিছু-কিছু আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে দর্শনে বিশ্বাস করতেন তাতে তাঁর কাছ থেকে কি বস্তুবাদী দার্শনিকের ভাষা-প্রয়োগ আশা করা সঙ্গত?

এখন পর্যন্ত বাংলা-সমালোচনা সাহিত্য বিদেশী সমালোচনার কাছে

অনেকাংশে ঋণী। বিদেশী সাহিত্য-পাঠের অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁদের সামনে কিছু ছাঁচ আছে—সেই ছাঁচের সঙ্গে সব কিছুই মেলা দরকার। উনিশ শতকে বাংলার স্কট, বাংলার বায়রন, বাংলার শেলি ইত্যাদি নামকরণের প্রয়াস ছিল। অশোকবাবুর প্রবন্ধেও আমাদের "দায়িত্বহীনতা" প্রমাণের জন্য এত বিদেশী নামের সমারোহ, এমনকি বিদেশী প্রবচন পর্যন্ত, সমালোচনা-সাহিত্যের সেই অপরিণত শৈশবকে স্মরণ করিয়ে দিল।

বাংলা-সাহিত্যের পথঘাটের সন্ধান যদি অশোকবাবু করতেন তবে বোধ হয় আমাদের নায়কদের "আমদানী স্থল" সম্বন্ধে তাঁকে ও-জাতীয় গবেষণায় প্রবৃত্ত হতে হত না। অশোকবাবু যখন তা করেন নি, তখন নিজেদের রচনার কুল-পরিচয় নিজেদেরই নিতে হয়।

বাংলা সাহিত্যে ১৯১৫ সাল একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বৎসর। এই বৎসরই ক। প্রথম আধুনিক বাংলা উপন্যাস চতুরঙ্গ প্রকাশ হয় খ। সবুজপত্র প্রকাশিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে কথ্য ভাষায় মনন-সমস্যামূলক ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত হয় এবং গ। শরৎচন্দ্রের নিষ্কৃতি প্রকাশিত হয়।—গোরা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ মহাজন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু ইতিমধ্যেই উনিশ শতকের নবজাগরণের স্বপ্নে ভাঙন ধরেছিল বলেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত আঙ্গিকে আবেগের সরল ঘাত-প্রতিঘাতে আগের মতো দৃঢ় পুরুষ চরিত্র আঁকা সম্ভব হল না, আর সম্ভব হল না ব্যক্তিত্বময় নারী-চরিত্র-সৃষ্টি। সৌন্দর্য আস্তিকতা ও যৌনজীবন (সুতরাং পারিবারিক জীবন) সম্পর্কিত বোধ বদলে গেছে। চতুরঙ্গে সর্বপ্রথম ক। প্রতীক ব্যবহৃত হল, খ। আদর্শ-বিভ্রান্ত ও মনন-রাজ্যের সমস্যায় কাতর নায়ক এল, গ। নায়ক ক্লাসিক-উপন্যাস-লব্ধ স্বাধীনতা হারাল, ঘ। ভাষায় স্পষ্টত কবিতাকে গ্রহণ করা হল, ও ঙ। রচনায় লেখকের ব্যক্তিত্ব প্রকট হল।

অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ গৃহস্থজীবনকে ইতিহাসের পটভূমিতে রাখবার যে উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন—তা-ও সার্থকভাবে প্রয়োগ করলেন ঘরে বাইরে-তে। ঘরে বাইরে, চার অধ্যায় ও গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডের কিছু গল্পে বঙ্কিমের ঐতিহ্য অনুসরণে ইতিহাস ও গার্হস্থ্য জীবনের মেলবন্ধন হয়েছে বটে কিন্তু পূর্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের সংযোগে তা নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। আর এই আধুনিক উপন্যাসের জন্মক্ষণেই তা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে রইল শরৎচন্দ্রীয় ধারা—সেখানে ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর কোনো জিজ্ঞাসা

নেই, সুতরাং ইতিহাস-গ্রথিত জীবনেরও তেমন কোনো সমস্যা নেই। তাঁর উপন্যাসগুলির বিষয় স্নেহ-প্রেম-ঈর্ষা ইত্যাদি সনাতন বিষয়গুলি ইতিহাসগত কোনো মূলভিত্তি পায় নি, অবশ্য পার্শ্ব-কাহিনী, পার্শ্ব-চরিত্র সৃষ্টিতে তা অনেকসময় এসেছে। স্বল্পকাল পরে বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য—অনারব্ধ নগর-জীবনকে সাহিত্যে আনবার চেষ্টা করলেন। অথচ কলকাতা যে একটি ঔপনিবেশিক নগর, কৃত্রিম, বানানো, অতএব এর সংগঠন ইউরোপীয় নগরের মতো নয়—এই সত্য তাঁদের কাছে পরিষ্কার ছিল না বলেই শরৎচন্দ্রের মতো তাঁদের রচনাও ইতিহাসগত-ভিত্তি পায় নি। এই ব্যর্থ নগর-সাহিত্যের অভিজ্ঞতাই মানিক-তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণকে গ্রামে পাঠিয়েছে। এবং এঁরাই বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের প্রধান ঔপন্যাসিক। কল্লোল-কালিকলম পত্রিকার সমকালেই সাহিত্যে জগদীশ গুপ্তের নীরব চেষ্টা, তারাশঙ্করের আগমনের প্রায় সমকালেই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃশীলা ও পরে আরও একটি উপন্যাস একদা-র প্রকাশ প্রমাণ করে তখনো মনন-নির্ভর সমস্যা, বিশিষ্ট ভাষা-ভঙ্গি, প্রতীক উপমা ইত্যাদির সচেতন ব্যবহার ও লেখক ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট উপস্থিতি ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত বঙ্কিম-রবীন্দ্র-ঐতিহ্য অনুসৃত হচ্ছিল,—যদিও মোটা-ধারা তখন শরৎচন্দ্রীয় ঐতিহ্যানুগ। এমনকি তারাশঙ্কর তাঁর ইতিহাস-চেতনা নিয়েও ভাববাদী দর্শনের চাপে শরৎচন্দ্রের অনুকূল, বিভূতিভূষণের দর্শনের ওপর কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রভাব ছিল না; একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি উপন্যাসে উল্লিখিত চরিত্র লক্ষণ মিলে যায়—তবুও তিনি সর্বতোভাবে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের অনুগামী নন—বরাবরই বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র।

খুব কম লেখকই শরৎচন্দ্রীয় ঐতিহ্যের সহজ পথ ত্যাগ করে বঙ্কিম-রবীন্দ্রের কষ্টসাধ্য পথ স্বীকার করেছেন। কিন্তু অতি কম সংখ্যক লেখকগণের দ্বারা অনুসৃত হলেও, এ ধারা রত্ন-গর্ভা। ধূর্জটিপ্রসাদ-অন্নদাশঙ্কর-জগদীশ গুপ্ত-দিলীপকুমার-গোপাল হালদার-সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসগুলিকে আমরা প্রক্ষিপ্ত ভাবতেই অভ্যস্ত—কিন্তু একটু সতর্ক হলেই দেখা যাবে—এঁরা বাংলা উপন্যাসের আদি ও সুষ্ঠতম ধারাটিকেই বহন করে নিয়ে চলেছেন।

প্রক্ষিপ্ত ভাবতে অভ্যস্ত বলেই ১৯৫০ সালের পর থেকেই যে পরিচয়-নতুন সাহিত্য-সাহিত্যপত্রে একপ্রকারের বিশিষ্ট ছোটগল্প প্রকাশিত হচ্ছিল

তা আমাদের নজরে পড়ে নি। ননী ভৌমিক অতি অল্প লেখেন। অনেকে জানেনই না, অনেকে মানেনই না—তিনি বড় লেখক। তাই তাঁর এ-সময়কার গল্পগুলি কারো চোখে পড়ে নি। একটু সতর্ক হলেই চোখে পড়ত, বিশেষত ১৯৫৬ সালের শারদীয় মাতৃভূমিতে প্রকাশিত মাটির পা আর ঐ বৎসরই শারদীয় সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত পূর্বক্ষণ গল্প দুটি। বাংলা গল্পে এ কোন্ চেষ্টা—ডায়েরিও নয়, চেতনাপ্রবাহও নয়—নায়ক-নায়িকা স্বদেশীও নয়, আইন-অমান্যকারীও নয়—একেবারে সাধারণ মানুষ—যাদের জীবন-যাপনের অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নের সঙ্গে ইতিহাসের অনেক মূল-সমস্যা জড়িত—সেই এই দশকের মানুষ।

সমরেশ বসুর মরশুমের একদিন, বিষের ঝাড়, জোয়ার ভাঁটা ও আরো পরবর্তীকালে প্রকাশিত পাড়ি আমাদের ভালো লেগেছে চমৎকারী বিষয়ের জন্য। অথচ এগুলির নতুনত্ব আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে। সংক্ষিপ্ত ঘটনাকাল, আপাত যোগসূত্রহীন ঘটনা, অন্তঃশীল যোগসূত্র—ইত্যাদিই এই গল্পগুলির নতুনত্ব। এই কালেই শরৎচন্দ্র-ঐতিহ্য, শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্কর-ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। সমরেশ বসুই তখন একমাত্র লেখক—যাঁর দুই পা শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্করের ঐতিহ্যের মাটিতে থাকা সত্ত্বেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আকর্ষণ যাঁকে ঐ ঐতিহ্যের কেন্দ্রাতিক্রমণমুখী করেছিল।

বর্ষীয়ান সাহিত্যিকদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর গল্পগুলিতে ঠিক এই সময়ই চেষ্টা করছিলেন, সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মধ্যে অতি স্পষ্টভাবে সমাজ-জিজ্ঞাসা উত্থাপন করা বা অতি তির্যকভাবে কোনো প্রতীককে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। যদিও তাঁর অধিকাংশ গল্পই অতি সংক্ষিপ্ততার জন্য রেখাচিত্রের মতো, তবু এই সূত্রে সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত তাঁর টেস্ট-টিউব গল্পটির নাম না করলে অপরাধ হবে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র-ও এই প্রসঙ্গে অবশ্য আলোচ্য।

আর ভাবধারাগত দিক থেকে উল্লিখিতনামাদের সঙ্গে মিল না থাকলেও, ও তাঁর বিষয় সন্ধানের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও এই সময় প্রকাশিত বিমল করের কয়েকটি গল্পে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল তিনি ঘটনা পরিহার করতে চান, দর্শনকে আরো স্পষ্টভাবে গল্পে আনতে চান, কাব্যের ভাষার সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা রচনা করতে চান, সারা গল্প জুড়ে একটি প্রতীক রক্ষার চেষ্টা তখন না থাকলেও—গল্পের পার্শ্ব-ভাববস্তুকে সংহত করে প্রতীক সৃষ্টির চেষ্টা তখনই তিনি করছিলেন।

আর এই ১৯৫৬-৫৭ সালেই তরুণদের কয়েকজনের কয়েকটি গল্প বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুপ্রচারিত প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা এই সকল গল্প প্রকাশে এগিয়ে আসেন। তরুণ লেখকদের একটি বৃহৎ অংশ একটি বিশিষ্টভাবে লিখে সকলের নজরে পড়েন। এবং তা থেকেই অধুনা-নিন্দিত বা প্রশংসিত নতুন সাহিত্য-আন্দোলনের "জন্ম"।

বস্তুত, ১। এই নতুন সাহিত্য-আন্দোলন আমাদেরই সৃষ্টি নয়। দীর্ঘ পঁচিশ-তিরিশ বৎসর ধরে এই চেষ্টা ব্যক্তিগত, বিচ্ছিন্ন ও কিছুটা অসংগঠিত-ভাবে চলে আসছিল ১৯৫০ সালের পর থেকেই পরিবর্তনের প্রয়োজন সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তারই ফল আজকের এই সমবেত চেষ্টা। ২। বাংলাদেশের দু-একটি পত্রিকা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত বাজার সত্ত্বেও, এবং সাধারণত 'নামী' লেখকদের রচনা পুষ্ট হয়েও—এই ধরনের নতুন গল্পের চেষ্টাকে অভিনন্দনযোগ্য সাহসিকতার সঙ্গে বৃহত্তর পাঠকশ্রেণীর কাছে পৌঁছে দেয়াতেই এই চেষ্টা আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছে। ৩। এবং বঙ্কিম-রবীন্দ্র ঐতিহ্যের অনুগামী ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বতন্ত্র বিশিষ্টতার পরবর্তী বলে—এই দুই পরস্পর-ঘনিষ্ঠ অথচ শরৎচন্দ্র-ঐতিহ্য থেকে সমদূরবর্তী ধারার সমন্বয়ের দ্বারা শরৎচন্দ্র-ঐতিহ্যের ফলে অবহেলিত বাংলা উপন্যাসের মূল-ঐতিহ্যের নতুন প্রবাহ রচনার পথ খোলা থাকল—এই তরুণদের সম্মুখে। ৪। কিন্তু পৃথিবীর কোনো সাহিত্যিকই কোনোদিন নিজের কর্তব্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করে সাহিত্য রচনা করতে বসেন না। লিখতে লিখতে তাঁর নিজের অভিপ্রায় নিজের কাছে স্পষ্ট হয়, ভবিষ্যতের কিছু-কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করা গিয়েছিল বলেই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছে। আমাদের বিষয়ের মধ্যে রাজনীতি, বিচিত্র কলকাতা শহরের মাঝখানে মানুষের অস্তিত্বের সমস্যা, এই শতকের সময়ের দায়, পরিবার, ব্যক্তিত্ব, প্রেম—আসতে পারে। তার সঙ্গে আসতে পারে পাপবোধ, নিয়তি-বোধ, আদর্শ-ধ্বংস। এ সবই তো ইতিপূর্বে লেখা হয়েছে। তবে নতুনত্ব কোথায়? নতুনত্ব—এ সকলের মধ্যে আত্মার সমস্যার সন্ধান। এই শতকের পীড়িত, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন মানুষের আত্মা-সন্ধানই আমাদের সাহিত্যের বিশেষ বিষয়। আর এই বিষয় প্রকাশের জন্য কখনো খবরের কাগজের রিপোর্টের ভঙ্গি, কখনো রিপোর্টাজের ভঙ্গি, কখনো কবিতার ভঙ্গি, কখনো নাটকের ভঙ্গি,

কখনো স্বপ্নের আশ্রয়, কখনো চেতনা-প্রবাহের আশ্রয়, আমাদের নিতে হয়। এই সকলের চিহ্ন আমাদের রচনায় পাওয়া যায়, কিন্তু এদের কোনো একটিকেই আমাদের ট্রেডমার্ক বলা চলে না। সে কারণেই কখনো কখনো কোনো কোনো গল্প হয়তো দুর্বোধ্য হয়, কখনো হয় কিঞ্চিৎ ভাবপ্রবণ—ব্যক্তিগত ক্ষমতার অনুপাত সর্বক্ষেত্রে সমান না হওয়ার জন্যও এ রকম ঘটে, আবার ঘটে সমস্যা ধরতে পারার অক্ষমতা থেকেও। অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ লেখক বয়োকনিষ্ঠদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন—তাঁরা আধুনিকতা বলতে বুঝেছেন চেহারার একটি বিশিষ্ট ছাঁচ। তাই ফুটনোট ইত্যাদি নানা অলঙ্কারে ভূষিত করে, বা, নায়িকার আত্মকথনের ভঙ্গিতে তাঁরা লেখেন-কোনো কুলবধূর সূক্ষ্ম অসতীত্বের মতো, বা কোনো অসতীর সূক্ষ্ম সতীত্বের মতো বা কোনো প্রেমের তথাকথিত বাস্তব-ব্যাখ্যার মতো—বাংলা কথা-সাহিত্যের মধ্যযুগের বিষয়াবলী। আত্মা-সন্ধান যখন আমাদের বিষয়, তখনই আত্মচিন্তা, আত্মকথন ইত্যাদি ভঙ্গি গ্রহণ করতে হয়। আমাদের বিষয়ের এই বিশেষত্বটুকু মনে রাখলে ভঙ্গির বিশিষ্টতার ব্যাখ্যা মিলবে।

তাঁর প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে অশোকবাবু বলেন, "কেন আজ, ১৯৬০ সালে, বাংলা-সাহিত্যে তাঁরা এই বিশেষ নূতন রীতি প্রবর্তন করতে উদ্যোগী হয়েছেন তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।" পত্রান্তরে প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধ অশোকবাবু যে পড়েছেন তার প্রমাণ তাঁর প্রবন্ধের মধ্যেই আছে। সেই প্রবন্ধের প্রথমাংশে তো আমি এই প্রশ্নেরই উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি। পূর্ববর্তী আলোচনার সঙ্গে তা থেকে অংশ-বিশেষ যোগ করলে সব মিলিয়ে একটা উত্তর হবে—"উনিশ শ সাতচল্লিশের পর বাংলা-সাহিত্যে এক ঐতিহাসিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। পুরনো লেখকরা আর নতুন সমস্যাকে রূপ দিতে পারলেন না। নতুন সমস্যা যাদের দৃষ্টিপথে আছে এমন একটি জেনারেশনের জন্য যেন প্রস্তুতি ছিল।...নতুন যে সাহিত্য-আন্দোলনের কথা উঠেছে তা তো মোটে দু-তিন বৎসরের কথা (১৯৫৬-৫৭),—অর্থাৎ স্বাধীনতা পাবার দশ বছর কেটে যাবার পর। এতদিনে এই শাসন ব্যবস্থার অদল-বদল, সমস্যার স্বরূপ, নতুন মানুষজন অনেক বেশি পরিচিত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে এক লেখক-গোষ্ঠির তৈরি হওয়ার কথা যারা চেষ্টা করবে সমস্যা-গুলোকে নতুন ভাবে দেখতে।...নতুন পুরুষের লেখকগণের দায়িত্ব হচ্ছে ৪৭-এর পরবর্তী ও প্রস্তাবিত সমাজের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো ও কলম

চালানো।···লেখা বদলাতে হবে। পুরনো ঢঙে নতুন বিষয় নিয়ে লেখা যায় না। নতুন বিষয় চাই, নতুন ঢঙ চাই। ঢঙ আর বিষয়ের বদল হলে বলতেই হবে নতুন সাহিত্য আন্দোলন শুরু হয়েছে।"—তবু কি অশোকবাবু বলবেন বাংলাসাহিত্যে আমরা পচা বিলেতি মালের উট্‌কো দোকানি ?

তিন

এইবার সেই বহু আলোচিত 'চেতনা-প্রবাহ' প্রসঙ্গ। এটা একটা অত্যন্ত প্রচলিত ধারণা যে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আসলে চেতনা-প্রবাহী গল্প লেখা। অশোকবাবু আমার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন—ফর্ম ও বিষয় সম্পর্কে আমার ধারণা অদ্ভুত। অশোকবাবুর উদ্ধৃতিটিতে আমার প্রবন্ধের ঐ অংশের শেষ লাইনটি বাদ দেওয়া হয়েছে। আমি লিখেছিলাম—"যদি বিষয়ের ক্ষেত্রে নতুনত্ব না থাকে দুঃখ হবে, কিন্তু তাই বলে ফর্মের জন্য প্রাপ্য কৃতিত্ব হ্রাস করা যাবে কি? কিন্তু সত্যি করেই এ ফর্মে কি কোনো পুরনো বিষয় বলা সম্ভব ?" ঐ শেষ লাইনটি কি প্রমাণ করে না—ও আমার পূর্ব-উদ্ধৃত অংশবিশেষ কি সেই প্রমাণকে সমর্থন করে না যে—বিষয় ও আঙ্গিকের অদ্বৈত সম্পর্ক আমার অজানা নয়। তবে, যেহেতু ফর্মগত পরিবর্তন দৃষ্টি আকর্ষণ করে আগে, এবং বিষয়গত নতুনত্ব ধারণায় আসে যথেষ্ট সচেতন অধ্যবসায়ের পর, সে কারণেই বলেছিলাম—এই চেহারার নতুনত্বও নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। এর মানে এই নয় যে আমি আঙ্গিকসর্বস্বতার কথা বলেছি।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ মহাশয় চেতনা-প্রবাহ নিয়ে যথেষ্ট কথা বলেছেন। শুধু বলেন নি তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি। এবং চেতনা-প্রবাহ বিষয়ক তাঁর মন্তব্যে মনে হল—তিনি চেতনা-প্রবাহ-মূলক লেখার সঙ্গে স্বগতোক্তির বা ভাবনার, কোনো পার্থক্য করতে চান না। আমাদের দু-একটি রচনা নিঃসন্দেহে চেতনা-প্রবাহ-আশ্রয়ী। কিন্তু ঐ আমাদের ট্রেডমার্কা নয়।

যাহোক, আমার ইচ্ছামতীর শৈলী সম্পর্কে অশোকবাবুর "কোনো নালিশ নেই" অন্য গল্পগুলো সম্পর্কে আছে। আর দীপেন্দ্রনাথ, প্রদ্যোৎ গুহ, সত্য গুপ্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। "প্রথমত স্থান-কাল-পাত্রের পরিচয় গোপন রাখা। দ্বিতীয়ত লেখবার ভাষায় স্বপ্নের প্রলাপের এবং চেতনা-প্রবাহের বাঁধুনিহীনতা এবং বিচ্ছিন্নভাব ইচ্ছাকৃতভাবে আরোপ

করা; তৃতীয়ত বাংলা-ভাষা ব্যবহার না-করে একটা code ভাষা ব্যবহার করা।"

অশোকবাবু সাহিত্যিকের দায়িত্বহীনতা প্রমাণ করতে প্রবন্ধ লিখেছেন। অথচ তাঁর এই অভিযোগগুলিকে গল্প বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করার কোনো দায়িত্ব তিনি বোধ করলেন না। একমাত্র তৃতীয় অভিযোগটি তিনি কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করেছেন। আলোচনার প্রথমেই তিনি যে আপত্তিকর উপায়ে গল্পের সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন—তাতেই তো তিনি প্রতিটি গল্পের স্থানকালপাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন, ঘটনা চেতনা-প্রবাহ ও স্বপ্নক্রম অনুযায়ী বলে দিয়েছেন। যেমন "সত্যবাবুর লেখাটির নায়ক অচিন্ত্য নামক এক যুবক, সম্প্রতি যার মা মারা গেছে এবং যে বেকার, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাকে তার দাদা-বৌদির ওপর নির্ভর করতে হয় এবং তার জন্য গ্লানি-বোধ করতে হয়। তার চেতনা-প্রবাহের বর্ণনা ছাড়া ঘটনা বলতে ঘটে অচিন্ত্যর একটা স্বপ্ন দেখা" ইত্যাদি। স্থান-কাল-পাত্রের পরিচয়, স্বপ্ন, চেতনা-প্রবাহ সবই তো অশোকবাবু বুঝতে পেরেছেন—তবু তাঁর অভিযোগ কেন ?

দীপেন্দ্রনাথের গল্পটি প্রসঙ্গে প্রথমেই বলছেন—"দীপেনবাবুর গল্পটিতে ঘটনাও তেমন কিছু নেই, চেতনাপ্রবাহও বড় একটা নেই। কী আছে তা বলা শক্ত।" অনুমান করি এইখানেই অশোকবাবুর মুশকিল। তিনি ঘটনা চান, আর ঘটনা না থাকলেই সেখানে চেতনা-প্রবাহ থাকবে এটা ধরে নেন। অর্থাৎ লেখক কোনো এক বিশেষ আঙ্গিকে গল্প লিখে অন্য আঙ্গিকেই সেই গল্পটা কেন লিখলেন না—এ রকম অভিযোগও অশোকবাবু দায়িত্বশীলের মতোই করে থাকেন। দীপেন্দ্রনাথের গল্পটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অশোকবাবু ধরা পড়ে গেলেন যে তিনি আগাগোড়াই গল্পটি ভুল বুঝেছেন। তিনি বুঝেছেন, গল্পের প্রথম দিকে "গল্পের একজন নায়িকা আছে। তিনি একজন বীর-রমণী।" আর শেষাংশে "অন্য একটি যুবকের কথা বলা হয়।" গল্পের প্রথম থেকেই তো সেই যুবকটি উত্তম-পুরুষে উপস্থিত। বীরাঙ্গনার সঙ্গে তার ওপারের দেশে সাক্ষাতের স্মৃতি; আর গল্পটির গতি হচ্ছে: বীরাঙ্গনার বীরত্ব-মুগ্ধ যুবকটি নিজের অজ্ঞাতেই জীবনধারণ করে, জীবন-গত হতাশাবোধ থেকে পুনরায় জীবনে উজ্জীবিত হয়ে বীর হচ্ছে, আর সেই বীরাঙ্গনা বীরত্বের সিংহাসন থেকে নেমে এসে জীবনধারণ ক'রে, সাধারণভাবে জীবনধারণ ক'রে, আরো বড় বীর হচ্ছেন—হায়! জীবনযাপনই একটা সংগ্রাম, হায়! বেঁচে

থাকাটাই একটা বীরত্ব। আর হায়! অশোকবাবুর মতো সমালোচককেও এই কথাগুলো এইরূপ টীকা দ্বারা বোঝাতে হয়!

প্রতীক ও code কাকে বলে, উভয়ের রীতিনীতি কি প্রকার ইত্যাদি নিয়ে অশোকবাবু ছ-পাতা আলোচনা করেছেন। অতঃপর উদাহরণ দিয়েছেন তিনটি গল্প থেকে মাত্র চারটি বাক্যাংশ, সবশুদ্ধ বিশটি শব্দ। এই কি মার্কসবাদী সমালোচকের দায়িত্বজ্ঞান? " "নৌকো" "মোহানা" "দৈত্যপুরী" "অন্ধকার" এবং "সমুদ্র"—এরা প্রতীকও নয়, সংকেতও নয়, এরা code।"—এই উক্তিতে অশোকবাবুর ধারণা কি জানা গেল। তিনিই আশা করেন এগুলো প্রতীক বা সংকেত, তাঁর আশা না পূরলেই রাগ করেন। বস্তুত সর্বক্ষেত্রে এইগুলো প্রতীকও নয়; সংকেতও নয়—পরিবেশ রচনা করা হয়েছে, দৃশ্য আঁকা হয়েছে। কিন্তু বৈশিষ্ট্য এই যে—এগুলো আপাত-অপ্রাসঙ্গিক দৃশ্য, এই দৃশ্যগুলি বা পরিবেশ গল্পের মূলকেন্দ্রে গিয়ে মিলেছে—তখন এর নির্যাসটুকুই কাজে লাগছে।

অশোকবাবু উত্থাপিত সকল অভিযোগের উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তিনি প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গিতে লেখা গল্পগুলো সম্পর্কে কেন দায়িত্বহীনতার প্রশ্ন আনলেন না। এমনকি পরিচয়ের অনেক লেখককে তিনি বাদ দিয়েছেন। মনে পড়ছে ১৩৬৬ সালে শারদীয় পরিচয়ে প্রকাশিত আরও একটি সার্থক গল্পের কথা—যাতে অভিযুক্ত হবার মতো সব গুণগুলি (চেতনাপ্রবাহ ইত্যাদির আশ্রয় নেয়া, স্বপ্ন বর্ণনার মধ্যে দিয়ে স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমারেখা লোপ করা) আছে। তবু অশোকবাবু বা চিত্তরঞ্জনবাবু এটিকে আলোচনায় টানেন নি। তবে কি আশঙ্কা করব অশোকবাবুর দৃষ্টিক্ষেত্রে আমাদের মতো চার হতভাগ্য লেখকই আছি?

ইসাডোরা ডানকানের আত্ম-জীবনীতে পড়েছিলাম এক কৌতুককর কাহিনী। জনৈক সমালোচক তাঁকে সর্বগুণান্বিতা বলে প্রশংসা করেও বলেন "কিন্তু ইসাডোরা একটু সুরকানা।" ইসাডোরা ভদ্রলোককে ডেকে পাঠান। চা-খাওয়ার পাঠ চুকল। অতঃপর আলাপ শুরু। ইসাডোরা যতই সুর প্রসঙ্গে কথা বলেন সমালোচক হাঁ হুঁ কিছুই বলেন না। অবশেষে ভদ্রলোক সসঙ্কোচে বললেন—"আমি একটু কানে খাটো।" হতবাক ইসাডোরা বুঝতে পারলেন "সুরকানা"-র উৎস কোথায়!

অশোকবাবু নিশ্চয়ই সে-জাতীয় সমালোচক নন!

দেবেশ রায়

১।৪।৬১

সংস্কৃতি সংবাদ

চিত্র-প্রদর্শনী : রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্ রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির যে-প্রদর্শনীটির ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে এমন অনেকগুলি ছবি দেখতে পাওয়া গেল যেগুলি ইতিপূর্বে আমাদের দেখার সুযোগ জোটেনি। তার কারণ, এই সব ছবি বিভিন্ন জনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নেওয়া। সাধারণ চিত্রদর্শকদের কাছে রবীন্দ্রনাথের এতগুলি অ-দৃষ্টপূর্ব ছবি উপস্থিত করার জন্যে অ্যাকাডেমিকে ধন্যবাদ—হলের মধ্যে প্রচণ্ড গরম এবং সাধারণ লোকের পক্ষে প্রবেশমূল্য একটু চড়া হওয়া সত্ত্বেও।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলিকে বিষয় অনুযায়ী যেসব ভাগে ভাগ করা হয়—যেমন : দৃশ্যচিত্র, পশু-পাখির ছবি, নারী-পুরুষের মুখ আর বিভিন্ন ভঙ্গিতে ধরা নরনারীর ফিগার—সেই সব ধরনের ছবিই এই প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের আঁকা নরনারীর মুখগুলির প্রত্যেকটিতে রূপ পেয়েছে এক-একটি আশ্চর্য রকম স্পষ্ট ব্যক্তিচরিত্র—এবং এই সব চরিত্রের প্রত্যেকটি অন্যগুলির থেকে আলাদা। জীবজন্তু-পশুপাখির ছবিগুলি কল্পনাময়, স্বপ্ন বা দূর স্মৃতির জগতে জমে থাকা নানা রকম আকৃতি মেশানো। ঠিক আমাদের চোখে দেখা পরিচিত প্রাণী যেমন তারা নয়, তেমনি আবার বস্তুবিচ্ছিন্ন অ্যাবস্ট্র্যাক্‌শনও নয়। কবির তুলিতে তারা কিছুটা অতিকৃতি পেলেও বিমূর্ত হয়ে ওঠেনি। অপূর্ব একটি রেখাগত ছন্দে বিধৃত হয়েছে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রূপায়িত মানুষের ফিগারগুলি। রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের রেখা-রচনার একটি অপূর্ব নিদর্শন দেখা গেল এই প্রদর্শনীর নৃত্যরতা একটি নারীর দেহভঙ্গিতে (৪১ নং)।

ব্যক্তিগতভাবে এই লেখকের অবশ্য সবচেয়ে ভালো লাগে রবীন্দ্রনাথের ল্যাণ্ডস্কেপ বা দৃশ্যচিত্রগুলি। এগুলি একই সঙ্গে রীতিমতো বাস্তবানুগ ও স্পর্শগ্রাহ্য অথচ আদিম এক প্রাণজগতের রহস্যজালে ঘেরা আর স্বপ্নে দেখা কোন্ এক চলমান দৃশ্যের স্মারক। অধিকাংশ ল্যাণ্ডস্কেপেই এসেছে আশ্চর্য এক আলোর খেলা, অপূর্ব এক ধরনের রঙের ভাস্বরতা আর এরই মারফতে সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছে কল্পনাময় একটি ত্রিমাত্রিক গুণ।

সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে—এবং বিশেষ করে তাঁর এই

ল্যাণ্ডস্কেপগুলিতে—এমন একটা ঘনমান বা ভল্যুম এসেছে যা আমাদের দেশের চিত্রকলায় একটা নতুন জিনিস। এগুলিতে স্থানগত পরিপ্রেক্ষিত আনার বৈশিষ্ট্যটুকুও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এসব ছবিতে কবি যে উজ্জ্বল আর ভাস্বর রঙ ব্যবহার করেছেন সেটাই হয়ে উঠেছে পরিপ্রেক্ষিতের বিভিন্ন স্তরের ও ব্যাপ্তির আধার।

রঙের এই বিশিষ্ট ও মৌলিক প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে এনেছেন ত্রিমাত্রিকতা। রঙের মধ্যে দিয়ে আলোর বিস্তারকে অপূর্ব সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এই সব দৃশ্যচিত্রে। অধিকাংশ ল্যাণ্ডস্কেপেই অন্ধকার সম্মুখদৃশ্যের পেছনে উচ্ছ্বসিত আলোর প্রভা একদিকে যেমন এক কল্পনাময় দ্যুতির সঞ্চার করেছে, অন্যদিকে তেমনি এক দেশগত মাত্রার ধারণাকে দর্শকের মনে স্পষ্ট করে তুলেছে। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে এই সব ছবিতে কম্পোজিশনের গুণ ততটা নেই যতটা আছে ফর্ম্যাল বিন্যাস।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আরেকটি বিশিষ্ট শিল্পগুণ হল তার টেক্সচার। তাঁর আঁকা প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতে—বিশেষ করে দৃশ্যচিত্রগুলিতে—এই সযত্ন ও সুনিপুণ টেক্সচার সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত রেখার বুনুনির মধ্যে দিয়ে। ফর্মগত যে বিশেষ বিশেষ গুণগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে তার নিজস্ব বিশিষ্টতা দেয়, সেই ফর্মগত বৈশিষ্ট্যকে—এবং কোথাও বা সেই বৈশিষ্ট্যের অতিক্লৃতিকে—রেখানির্ভর ছন্দে বিন্যস্ত করেছেন কবি। এই রেখা এত স্বতঃস্ফূর্ত, পরিমিত ও সাবলীল যে কোনো কোনো ছবি দেখে হঠাৎ এরকম মনে হতে পারে—ভারতীয় চিত্রকলার সুচিরকালের ঐতিহ্য-অনুসারী লিনিয়রিজম্ বা রেখানির্ভরতা হয়তো বা রবীন্দ্রনাথের হাতেই প্রথম সার্থক আধুনিকতার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হল।

রবীন্দ্র মজুমদার

পরিচয়

আষাঢ় । ১৩৬৮

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়